পঞ্চম অধ্যায়

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' কাব্যের কাহিনি গ্রন্থনা ও চরিত্র চিত্রণ

চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে রাধা-কৃষ্ণলীলা কথা নিয়ে অ-বাংলা ভাষায় রচিত অথচ বাংলা ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য হিসেবে পাওয়া যায় জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'। পৌরাণিক কৃষ্ণের মহিমাকে সেখানে স্বীকৃতি জানালেও 'হরিবংশ' ও 'ভাগবত' বহির্ভূত রাধাই সেখানে কাব্যের নায়িকা। আবার পঞ্চদশ শতাব্দীর বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ পৌরাণিক কৃষ্ণের মহিমা থাকলেও লোকরুচি প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। এর পাশাপাশি মালাধর বসুর ভাগবত অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এ লোকায়ত রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা নয়, ভাগবতীয় ভক্তিধর্মকে বাঙালি পাঠক-সমাজে বিস্তৃত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী এবং ষোড়শ শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গলকারদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর আবির্ভাবে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার সমীকরণে এল এক উলট্‌পুরাণ।

চৈতন্যের প্রভাবে শুধু পদাবলী সাহিত্যই প্রভাবিত হল না, ভাগবতের অনুবাদেও তাঁর প্রভাব পড়ল সমান ভাবে। চৈতন্য পূর্ববর্তী কালে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য সত্তাকেই গ্রহণ করা হল বেশি সেখানে পরবর্তীকালে বড় হয়ে দেখা দিল শ্রীভগবানের মাধুর্য সত্তা। যদিও চৈতন্যদেবের আগমনের পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে ভাগবত কেন্দ্রিক কৃষ্ণলীলার এক বিশেষ প্রচার হয়েছিল, তা প্রাক্-চৈতন্য যুগের বাংলা সাহিত্য, বিভিন্ন শিল্পকলার নিদর্শন, পোড়ামাটির কাজ প্রভৃতি দেখলেই বোঝা যায়। জানা যায় যে, ভাগবত পুরাণের অল্প-স্বল্প প্রচার আরম্ভ হয়েছিল খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর দিকে পূর্ব ভারতে। এই দেশে খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ভাগবতপুরাণের প্রচার বিশেষ ভাবে হয়েছিল মাধবেন্দ্রপুরীর মাধ্যমে। এরপর থেকেই বাংলায় কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও মথুরালীলা সম্বন্ধে সাধারণভাবে বাঙালির কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল। দেখা যায় যে, বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস, মালাধর বসু সকলেই ভাগবত পুরাণের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এখানেই যে, বাংলা ভাষায় ভাগবত পুরাণের অনুবাদ খুব বেশি হতে দেখা যায় নি। যে কয়েকটি অনুবাদ পাওয়া যায় তাও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নয়। রঘুনাথ ভাগবতাচার্যই প্রথম এই বিপুল বিশাল

ভাগবত গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদে অগ্রসর হবার দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। রঘুনাথ রচিত এই গ্রন্থ সম্পর্কে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'(প্রথম পর্যায়) গ্রন্থে ভূদেব চৌধুরী জানিয়েছেন--

> "গ্রন্থ রচনা প্রসঙ্গে ভাগবতাচার্য পণ করেছিলেন,-- 'মহাভাগবতে না কহিব অন্য কথা'।– আনুপূর্বিক গ্রন্থটির মধ্যে তিনি এই পণ সম্পূর্ণ রক্ষা করেছেন। সুবৃহৎ অনুবাদ কাব্যটিতে শ্রীমদ্ভাগবতের মোটামুটি বারটি স্কন্ধেরই অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু, এই অনুবাদ মূলের আক্ষরিক অনুসরণমাত্রই নয়; প্রতিটি স্কন্ধের মূল প্রতিপাদ্যটুকু গ্রহণ করে কবি স্বাধীনভাবে বাংলা ভাষায় তার রূপায়ণ সাধন করেছেন। কোন স্কন্ধে মূলাপেক্ষা অধ্যায় সংখ্যা বেশি, কোথাও বা কম। কোথাও কোথাও মূলের শ্লোকাবলী এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে গৃহীত হয়েছে। মোট কথা, মূল ভাগবত-কথাকে কবি ইচ্ছামত ঢেলে সাজিয়েছেন; আর এই নবীন রূপ-সজ্জায় উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার পরিচয় প্রায় সর্বত্র সুস্পষ্ট।[১]

এখানে তিনি যে কথা বলেছেন সেটি আমাদের মতে আংশিক সত্য। কারণ রঘুনাথ প্রতিটি স্কন্ধের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেটিকে গল্পের পর গল্পে নিজের ইচ্ছেমত সাজান নি। তাঁর অনুবাদে আমরা ভাগবতের শ্লোক পরম্পরা লক্ষ্য করেছি। তিনি হয়তো কোন কোন অংশ বর্জন করেছেন, কোন কোন অধ্যায়ের থেকে দুটি বা তিনটি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন মাত্র তবুও কাহিনি পরম্পরা তিনি বজায় রেখেছেন। আর একটি বিষয় তিনি বলেছেন, মূলের অপেক্ষা এই কাব্যের কোন কোন স্কন্ধে নাকি অধ্যায় সংখ্যা বেশি। আমরা কিন্তু কোন স্কন্ধেই অধ্যায় সংখ্যা বেশি দেখিনি, যা দেখেছি তা বরঞ্চ অনেকটাই কম। তিনি কোন স্কন্ধে ক'টি অধ্যায় রেখেছেন এই বিষয়ে পরে আলোচনা করেছি।

নন্দলাল বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থে কী জানিয়েছেন সেটি একবার দেখে নেওয়া যাক্। তিনি জানিয়েছেন—

> "শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য-প্রভু বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'-গ্রন্থ সমগ্র 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র সর্ব্বপ্রথম পদ্যানুবাদ-গ্রন্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরামানন্দ বসুর পিতামহ গুণরাজ খান উপাধিক শ্রীমালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে ১৩৯৫-১৪০২ শকাব্দায় অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৪৭৩-১৪৮০ সালে 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র এক পদ্যানুবাদ গ্রন্থ রচনা করেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রচুর প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং ঐ গ্রন্থ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ৪০১ শ্রীচৈতন্যাব্দে অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ

তিন স্কন্ধের পদ্যচ্ছন্দে মর্ম্মানুবাদ, উহা আক্ষরিক অনুবাদ নহে; কিন্তু শ্রীভাগবতাচার্য্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' সমগ্র 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র অনুবাদ। ১ম-৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত মর্ম্মানুবাদ হইলেও শেষ তিন স্কন্ধের আক্ষরিক অনুবাদ বলা যাইতে পারে। প্রথম নয় স্কন্ধের মর্ম্মানুবাদের মধ্যেও 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র প্রকৃত তাৎপর্য্য এইরূপ অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত নিবদ্ধ হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে সংস্কৃত-ভাষায় অজ্ঞ ব্যক্তিও 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র মূল-তাৎপর্য্য ও রহস্য অবগত হইতে পারেন।"[২]

নন্দলাল বিদ্যাসাগরের মতে রঘুনাথকৃত এই গ্রন্থ সমগ্র ভাগবতের সর্বপ্রথম পদ্যানুবাদ গ্রন্থ। এর আগে মালাধর ভাগবতের শেষ তিন স্কন্ধের অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু সেটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়। রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের অনুবাদ মর্মানুবাদ হলেও শেষ তিন স্কন্ধের আক্ষরিক অনুবাদ। রঘুনাথ রচিত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' সমগ্র ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ কিনা সে সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন—

"...গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ভাগবতাচার্য্য (রঘুনাথ) ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এই অনুবাদখানি বেশ সুন্দর, ...অনুবাদ প্রায় ২০,০০০ শ্লোকে পূর্ণ।"[৩]

আবার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

"ভাগবতাচার্য উপাধিক রঘুনাথ পণ্ডিতের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' ভাগবতের পুরা সারানুবাদ হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে কেহ কেহ মূল ভাগবতের সমস্ত স্কন্ধেরই সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভাগবতের বিরাট পরিধিকে তাঁহারা প্রায়শঃই অতিশয় সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন; ফলে মূলের কাহিনীটি কোন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র, মূলের রসের কোন স্বাদই এই সমস্ত সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ হইতে পাওয়া যাইবে না। সেই দিক দিয়া ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' উল্লেখযোগ্য। কারণ কবি ইহাতে ভাগবতের সমস্ত স্কন্ধই অনুবাদ করিয়াছেন, এবং অনুবাদটি মূলের সারানুবাদ হইলেও খুব সংক্ষিপ্ত নহে।"[৪]

উপরিউক্ত বক্তব্যগুলি থেকে বোঝা যায় যে, রঘুনাথ রচিত কাব্য সমগ্র ভাগবতের সর্বপ্রথম পদ্যানুবাদ গ্রন্থ। এর আগে মালাধর বসু সংস্কৃত ভাগবতের অনুবাদ করলেও তিনি শুধুমাত্র দশম-একাদশ ও দ্বাদশের কিছুটা অংশ মাত্র অনুবাদ করেছিলেন। সে অনুবাদও হুবহু অনুবাদ নয়, মর্মানুবাদ মাত্র। কিন্তু রঘুনাথ কৃত অনুবাদ সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ। বলাবাহুল্য, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য যে অনুবাদ করেছিলেন সেখানেও মূল ভাগবতের প্রথম নয়টি স্কন্ধের অধ্যায় সংখ্যা কমিয়ে, শেষ তিনটি স্কন্ধের আক্ষরিক অনুবাদ তিনি করেছিলেন। বারোটি স্কন্ধে, তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায়ে, আঠারো হাজার শ্লোকে নিবদ্ধ রয়েছে ভাগবত। এই বৃহদাকার ভাগবতের যথাযথ আক্ষরিক অনুবাদ যে সাধারণ মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন হবে তা অনুধাবন করতে পেরেই কবি ভাগবতের প্রথম নয়টি স্কন্ধের সংক্ষেপণ করে, তার মর্মানুবাদ করার সুপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। রঘুনাথ তাঁর গ্রন্থে মূল ভাগবতের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের অধ্যায় সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখলেও অন্যান্য স্কন্ধের অধ্যায় সংখ্যা কমিয়েছিলেন। তিনি কোন স্কন্ধের কতগুলি অধ্যায় কমিয়েছিলেন তার একটি তালিকা এখানে উপস্থাপন করা হল— 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর প্রথম স্কন্ধে মোট ১৯টি অধ্যায় থাকলেও, 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'-তে রয়েছে ৫টি অধ্যায়। দ্বিতীয় স্কন্ধের ১০টি অধ্যায়ের জায়গায় ২টি অধ্যায়, তৃতীয় স্কন্ধের ৩৩টি অধ্যায়ের জায়গায় ৯টি অধ্যায়, চতুর্থ স্কন্ধে ৩১টি অধ্যায়ের জায়গায় ৮টি অধ্যায়, পঞ্চম স্কন্ধে ২৬টি অধ্যায়ের জায়গায় ৮টি অধ্যায়, ষষ্ঠ স্কন্ধে ১৯টি অধ্যায়ের জায়গায় ৩টি অধ্যায়, সপ্তম স্কন্ধে ১৫টি অধ্যায়ের জায়গায় ৫টি অধ্যায়, অষ্টম স্কন্ধে ২৪টি অধ্যায়ের জায়গায় ৭টি অধ্যায় এবং নবম স্কন্ধে ২৪টি স্কন্ধের জায়গায় ৯টি অধ্যায় রয়েছে। কিন্তু শেষ তিনটি স্কন্ধের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের অনুবাদ কবি করেছেন। পয়ার অনুবাদের পাশাপাশি মূল শ্লোকের সংখ্যা উল্লেখ করেও কবি অনুবাদে কঠোর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ভাগবতের অনুবাদ করতে গিয়ে মূল কাহিনির কোনো পরিবর্তন করেন নি। তাঁর রচিত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' অন্যান্য অনূদিত ভাগবতের মতই পয়ার ত্রিপদীতে লেখা কাব্য। বিষয়সূচী বিন্যাসে ও অনুবাদ কর্মের পারিপাট্যে কবি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া একটি বিষয় বলা যায় যে, অনুবাদ গ্রন্থ হবার কারণে চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে আলাদা করে কবি কোন মৌলিকতা দেখাতে না পারলেও কাহিনি বয়নের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব চরিত্রের যথাযথ উপস্থাপনা কবির দক্ষতার পরিচয় বহন করে। এখানে আমরা কাহিনি গ্রন্থনা আলোচনার সূত্রে তাঁর চরিত্র চিত্রণের দক্ষতার দিকটিও আলোচনা করব।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের গুরু ছিলেন শ্রীচৈতন্যের নিত্য সহচর গদাধর পণ্ডিত। যাঁর ভাগবত পাঠ শুনে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য প্রেমাবিষ্ট হতেন। তাঁরই যোগ্য শিষ্যরূপে রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের মতন ভক্তকেও গৌড়ীয় ভাষায় ভাগবত রস পরিবেশনে তৃপ্ত করতে পেরেছিলেন। রঘুনাথের ভাগবত পাঠ শুনে শ্রীচৈতন্য যে বিহ্বল হয়ে পড়তেন সে কথা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, রঘুনাথের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'-র কি এমন বৈশিষ্ট্য যা ভাগবতের অন্য কোন অনুবাদ কর্মে নেই? মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর প্রতি মহাপ্রভুর শ্রদ্ধা থাকলেও, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' শুনে তাঁর সাত্ত্বিক ভাবোদয় হয়েছে এরূপ ঘটনার প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় নি। অথচ রঘুনাথের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' শুনে তাঁর যে ভাবোদয় হয়েছে, সে বিবরণ আমরা 'চৈতন্যভাগবত' থেকে পেয়েছি। তৃতীয় অধ্যায়ে রঘুনাথের পরিচয় দান প্রসঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রঘুনাথের কাব্যে এমন কি উপস্থিত যা তাঁকে আর সমস্ত অনুবাদকদের থেকে আলাদা করেছে ? সেই বিষয়টিই আমাদের আলোচনা করে দেখতে হবে।

ভাগবত অনুবাদের ধারায় অন্যান্য অনুবাদের মতোই পয়ার ত্রিপদীতে রচিত একখানি কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'। আমরা জানি, কাব্যের উৎকর্ষ এই ত্রিপদীতেই। ভাগবতের মতন কঠিন ভক্তিশাস্ত্র কবি রঘুনাথের সরল ও সরস অনুবাদের রীতিতে সর্বত্র মনোহারী হয়ে উঠেছে। একজন অনুবাদকের পক্ষে প্রথম ও প্রধান গুণই হল তার অনুবাদ কর্মের মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছানো, পাঠকের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে জায়গা করে নেওয়া। রঘুনাথ অনায়াসেই সে কাজ করতে পেরেছিলেন বলে আমাদের মনে হয়। বিষয়সূচী বিন্যাসে রঘুনাথের অনুবাদকর্মে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। বারোটি স্কন্ধে, তিনশ পঁয়ত্রিশটি অধ্যায়ে, আঠারো হাজার শ্লোকে নিবদ্ধ ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ প্রায় অসম্ভব। আর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে সম্ভব, তবুও সেই বিশাল বিপুল গ্রন্থ আপামর জনসাধারণ কতটা আত্মস্থ করত বলা কঠিন। সুতরাং সে কাজ না করে রঘুনাথ সংক্ষেপকরণের সঠিক পথই গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'-তে তাই দেখি প্রথম নয়টি স্কন্ধের শুধুমাত্র সারানুবাদই স্থান পেয়েছে। আর শেষ তিনটি স্কন্ধের অর্থাৎ দশম-একাদশ ও দ্বাদশের হয়েছে আক্ষরিক অনুবাদ। এই তিনটি স্কন্ধ অনুবাদের ক্ষেত্রে কবির নিষ্ঠা এতটাই প্রবল যে, পয়ার অনুবাদের পাশাপাশি মূল শ্লোকের সংখ্যা পর্যন্ত তিনি ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করেছেন। একটি বিষয় উল্লেখণীয় যে, প্রথম ন'টি স্কন্ধের মর্মানুবাদ করলেও সেখানে ভাগবতের মূল বক্তব্যসমূহ, জীবের পরমধর্ম,

ভগবানের অবতারের হেতু, ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সব কিছুই গুরুত্বের সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন।

'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থটি পাঠ করে দেখা যায় যে, ভাগবত শাস্ত্র বহির্ভূত কথা রঘুনাথ যথাসম্ভব না বলবারই চেষ্টা করেছেন। এটি তাঁর অনুবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। আর এখানেই রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য ভাগবত-অনুবাদকের বিস্তর পার্থক্য ঘটে গেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, যেমন 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-এর কবি মাধবাচার্যের উদ্দেশ্য ভাগবত অনুবাদ নয়, কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়নই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। আর সে কারণেই তিনি ভাগবতের পাশাপাশি 'হরিবংশ', 'বিষ্ণুপুরাণ' থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছেন নির্দ্বিধায়। আবার ভবানন্দের 'হরিবংশ'-এ প্রাচীন গ্রাম্য কৃষ্ণকথার প্রভাব এতটাই প্রবল যে সেখানে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি অনেকটাই।

রঘুনাথের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল — 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' কাব্যে 'রাধা' নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর সংযম। ভাগবতে আমরা রাধার নাম কোথাও ব্যবহৃত হতে দেখিনি। মালাধর বসুও 'রাধা' নাম ব্যবহার করেন নি তাঁর কাব্যে। রঘুনাথের কাব্যে 'রাসলীলা' অধ্যায়ে 'অনয়ারাধিতো' শব্দের অনুবাদে একবার মাত্রই রাধানাম ব্যবহার হতে দেখা যায়। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী হবার কারণে সেখানে রাধানাম না থাকা অবান্তর নয়, কিন্তু চৈতন্য আবির্ভাবের পরে বাঙালি কবির পক্ষে এ প্রলোভন দমন সত্যিই সংযমের পরিচয় বহন করে। তিনি 'মহাভাগবতে অন্যকথা' যত কম বলেছেন, তত অনুবাদকর্মটির নিষ্ঠা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুবাদক হিসেবে রঘুনাথের এই নিষ্ঠার পরিচয় দু-একটি উদাহরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় তৃতীয় শ্লোকে আছে—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।"[৫]

অর্থাৎ হে পৃথিবীর রসিক ভাবুক ভক্তবৃন্দ, এই শ্রীমদ্ভাগবত হল বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফল। শুকদেবের মুখ নিঃসৃত হওয়াতে তা অমৃতরসে সিক্ত হয়ে রয়েছে। তোমাদের দেহে

যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ এই ভাগবতরস অবিরাম পান করতে থাকো। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'-তে রঘুনাথ অনুবাদে লিখেছেন—

"নিগমকলপতরু বিগলিত ফলে।

শুকমুখে পতিত অমৃত মধুতরে।।

ক্ষিতিতলে অবতরি ভাগবত-নাম।

পিয় রে ভাবুক ভাই, রসিক সুজান।।"[৬]

আমরা দেখি সংস্কৃত 'ভাগবত' প্রথম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায় ২৮ তম শ্লোকে আছে—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।"[৭]

এই সংস্কৃত শ্লোকটির বাংলা অর্থ হল— এইসব অবতার ভগবানের অংশাবতার অথবা কলাবতার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, নিজেই অবতার। তবুও তিনি বার বার ভিন্ন অবতার গ্রহণ করে থাকেন। অসুরদের অত্যাচারে মানুষ যখন পীড়িত হয় তখন যুগে যুগে ভগবান নানা রূপ ধারণ করে তাদের রক্ষা করেন। রঘুনাথ 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থে প্রথম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে ৫০-৫১ নম্বর শ্লোকে অনুবাদ করলেন—

"যত যত অবতার করেন মুরারি।

কেহ অংশ কেহ কলা বুঝহ বিচারি।।

পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ অবতার-শিরোমণি।

অন্য-অবতার-অবতারী যদুমণি।।"[৮]

এখানে তিনি যে অনুবাদ করলেন তা মূলের হুবহু অনুবাদ। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই অনুবাদ যে সহজ সরল ও মূলের অনুগত হয়েছে তা নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা এর ব্যতিক্রমও দেখেছি। যেমন ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ২২ তম শ্লোক—

"বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং

লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।"[৯]

অর্থাৎ যে নয়ন ভগবানের মূর্তি অবলোকন করে না, ময়ূরপুচ্ছে চিহ্নিত নয়নের মতোই তা নিরর্থক। কিন্তু রঘুনাথের অনুবাদে দেখি—

"বৈষ্ণব-বিষ্ণুর মূর্ত্তি দেখেন নয়নে।

ময়ূর-পাখার চক্ষু জানিহ সমানে।।"[১০]

এখানে এই 'বর্হায়িতে তে নয়নে'-র অনুবাদ 'ময়ূর পাখার চক্ষু' শব্দ চয়নে ততটাও সার্থক হয়ে ওঠেনি বলেই মনে হয়।

রঘুনাথের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য পদাবলির সুর মূর্চ্ছনা ও ধ্বনি ঝংকার সৃষ্টি। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' কাব্যে পদাবলীর মুক্ত গতি বদ্ধ পয়ারে অপূর্ব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। ব্রহ্মার ভগবৎ দর্শনের কথা এই প্রসঙ্গে আমরা দেখাতে পারি—

"দেখরে দেখরে সুন্দর যদুনন্দনা।

ইন্দ্রনীলমণি কিয়ে এ শ্যাম-বরণা।।"[১১]

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের মনে পড়বে ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় অজামিল উপাখ্যানের কথা। কবি রঘুনাথ এই আখ্যানের উপক্রমণিকা হিসাবে মঙ্গলাচরণে 'পদ্যাবলী'-র নামমাহাত্ম্যমূলক বিংশ শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন। শ্লোকটি হল—

"বেপন্তে দুরিতানি মোহমহিমা সন্মোহমালম্বতে,

সাতঙ্কো নখরঞ্জনং কলয়তে শ্রীচিত্রগুপ্তঃ কৃতী।

সানন্দং মধুপর্কসংভৃতবিধৌ বেধাঃ স্বয়ং যত্নবান্,

বক্তুং নাম তবেশ্বরাভিলষিতে ব্রূমঃ কিমন্যৎ পরম্।।"[১২]

এই শ্লোকটির বাংলা অনুবাদ 'শ্রীশ্রীপদ্যাবলী' গ্রন্থ থেকে যে ভাবে পাই— হে সর্বেশ্বর যদি কোন মানব আপনার নাম গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে তখনই তার মহাপাপ সকল ভয়ে কম্পিত হয়। পত্নী, পুত্রাদি ও স্বজনগণের প্রতি যে মোহ সেটিও মহাভয় অবলম্বন করে। জীবের পাপ, পুণ্যাদি কর্ম লিখনে নিপুণ চিত্রগুপ্ত শঙ্কিত হয়ে নখ রঞ্জনী গ্রহণ করেন। অর্থাৎ পূর্বে পাপীগণের মধ্যে লিখিত শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণকারীর নাম সম্পূর্ণরূপে কাটবার জন্য দ্রুত নরুণ ধারণ করেন। ব্রহ্মলোক নিবাসী ব্রহ্মাও 'এই মানব, শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করলে দ্রুত বৈকুণ্ঠে গমন করবেন'—এই কারণেই সম্ভ্রমসহকারে মধুপর্ক গ্রহণ

করার জন্য পরম উদ্যম করেন। জানা যায় যে, চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন এই শ্লোকটি। কিন্তু এই প্রভাবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় দশম স্কন্ধেই। দশম স্কন্ধে দেখি তিনি নতুনভাবে মঙ্গলাচরণ ও স্তুতি বন্দনা করেছেন। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মদর্শনে ভাগবতের দশম স্কন্ধের অসামান্য গুরুত্ব এর থেকেই বোঝা যায়।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য রচনার সাধারণ নিয়ম মেনেই কবি কাব্যের শুরুতে মঙ্গলাচরণ করেছেন। সেখানে তিনি নিজ গুরু গদাধরের বন্দনা করে তাঁর পায়ে প্রণতি জানিয়ে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেছেন দেখা যায়। এই গদাধর গোস্বামী পণ্ডিতই তাঁর 'ইষ্টদেব' এবং কবির 'দেহ-মন-বাক্য' জুড়ে কেবল মাত্র তিনিই অধিষ্ঠিত। আমরা দেখি গ্রন্থের প্রারম্ভে সংস্কৃত মঙ্গলাচরণে তিনি নিজ গুরুদেব গদাধর পণ্ডিতের বন্দনা করেছেন—

"বন্দে নিত্যমনন্তভক্তিনিরতং ভক্তিপ্রিয়ং সদ্‌গুরুং

মদীশ্বরগদাধরং দ্বিজবরং ভক্ত্যৈকরূপাকৃতীং।"[১৩]

গ্রন্থের শুরুতে সংস্কৃত মঙ্গলাচরণে কবি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য কি সেটিও অত্যন্ত দৈন্য সহকারে ব্যক্ত করেছেন-- "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হরতু বঃ সন্তাপমন্তর্বহিঃ"[১৪] আবার বলেছেন--"কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী বিজয়তে তাপত্রয়োন্মূলনী"[১৫] অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী সমস্ত সন্তাপ-দুঃখ হরণ করে নেয়। ভাগবত অনুবাদের প্রারম্ভিক গুরু বন্দনা ও গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বলার পর রঘুনাথ বলেছেন—

"কেচিদ্ভাগবতাচার্য্য প্রেমভক্তিবিবৃদ্ধয়ে।

গীয়তে পরমানন্দং শ্রীগোবিন্দকথামৃতম।।"[১৬]

এখানে 'প্রেমভক্তিবিবৃদ্ধয়ে' পদটি লক্ষ্যণীয়। 'বিবৃদ্ধয়ে' শব্দটির অর্থ বৃদ্ধি করা বা বর্ধন করা। এখানে প্রশ্ন তিনি কি বর্ধন করছেন? উত্তরও তিনি নিজেই প্রদান করেছেন; সেই বর্ধন হল—প্রেম ও ভক্তি। প্রেমের অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেরণা লাভ করে, তাঁকে কলিযুগের পরম উপাস্য রূপে জেনে রঘুনাথ ভাগবতের যে অনুবাদ করেছেন সেখানে প্রেমভক্তি বৃদ্ধি ছাড়া আর কি থাকা সম্ভব? তাই তিনি অনায়াসেই বলতে পারেন—

"শুনিলে গোবিন্দ-প্রেম হয়, হেন জানি।"[১৭]

এরপর তিনি কৃষ্ণ বন্দনা করেছেন। কৃষ্ণ বন্দনা সূত্রেই তিনি মানুষের জন্মান্তরবাদের কথাও বলেছেন। মানুষ জীবীত থাকাকালীন কৃষ্ণ নাম না করার কারণেই অবিরাম এই সংসার চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। বাঙালি হিন্দু ধর্মে মানুষের মৃত্যুর সময় হরিনাম শ্রবণের একটি রীতি আছে। আমরা রঘুনাথের কাব্যেও এই বিষয়টি দেখতে পেয়েছি। কবি যেখানে বলেছেন--

"মুখে বাক্য থাকিতে না লয় কৃষ্ণনাম।
তবে লোক সংসার ভ্রময়ে অবিরাম।।
সুখে ভব তরিতে যাহার চিত্ত ধরে।
সে জন কেবল মাত্র কৃষ্ণনাম করে।।
কৃষ্ণনাম বিনে, ভাই, গতি নাহি আন।
কৃষ্ণ না ভজিলে কেহো নাহি পায় পার।।"[১৮]

এই বাণী তো শুধুমাত্র কোন কবি-অনুবাদকের হতে পারে না। সংসার-চক্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সংসার-ত্যাগী বাউলের ভাবধারা যেন এসে মিশে গেছে কবির চিন্তায়-চেতনায়।

দেব-দেবী বন্দনার পর কবি আবার তাঁর গুরু গদাধরের বন্দনা করেছেন। এবার তিনি জানিয়েছেন 'পাতকী জীব' উদ্ধারের জন্যই তাঁর গুরু অবতার গ্রহণ করেছেন। কবির কথায়—

"ক্ষিতিতলে কৃপায় করিলা অবতার।
অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার।।"[১৯]

তিনি গুরু বন্দনা করেছেন মোট দশটি শ্লোক জুড়ে। এর আগে মধ্যযুগের কোন কাব্যে বা কোন কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে এইভাবে গুরু বন্দনা দেখা যায়নি। এর থেকেই বোঝা যায় কবির জীবনে তাঁর গুরুর ভূমিকা অনেকটাই ছিল এবং গুরুর প্রতি কবির শ্রদ্ধাও সেকারণেই প্রদর্শিত হয়েছে। গুরু বন্দনার পর রঘুনাথ গণেশ বন্দনা করেছেন চার পংক্তিতে। অতঃপর কবি প্রণতি জানিয়েছেন, যার কৃপায় ভাগবত পরিচিতি হয়েছিল সেই ব্যাসদেবের পায়ে --

"বেদব্যাস চরণে করিয়ে নমস্কার।

যাঁহার কৃপায় ভাগবত পরচার।।

সর্ব্ব ধর্ম্ম সার বেদ পুরাণ-গোপিত।

হেন ভক্তিযোগ ভাগবতে প্রকাশিত।।"[২০]

গ্রন্থ রচনাকালে কবি রঘুনাথ তৎকালীন সময় ও সমাজ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন যে, দুরূহ সংস্কৃত ভাষা তৎকালীন সময়ে সাধারণ লোকের বোধগম্যের অনেকটা বাইরে ছিল। আর সেই কারণেই 'কথাচ্ছলে' অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় সহজভাবে তিনি 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' রচনা করবেন একথাও তিনি গ্রন্থে স্বীকার করে নিয়েছিলেন--

"দেব দ্বিজ-চরণ বন্দিয়া গুরু জনে।

কথাচ্ছলে ভাগবত করিব রচনে।।[২১]

এরপরেই রঘুনাথ ভগবানের সর্ব অবতারের স্তুতি করে চৈতন্য বন্দনা করেছেন—

"জয় জয় গৌরচন্দ্র চৈতন্য বিহার।

ভক্তকুল প্রাণনাথ ভক্ত অবতার।।

নিত্যানন্দ বলরাম সনে নিত্য রঙ্গ।

শ্রীঅদ্বৈত হরিদাস শ্রীনিবাস সঙ্গ।।

গদাধর প্রাণনাথ ভক্ত কুলপতি।

ভক্তরূপ অবতার ত্রিজগৎ গতি।।"[২২]

বন্দনা শেষে তিনি মূল অনুবাদে প্রবেশ করেছেন। ভাগবতের অনুসরণেই কবি তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থেও স্কন্ধ ও অধ্যায় রেখেছেন। তবে মূল ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে যেখানে দেখি মোট ১৯টি অধ্যায় রয়েছে, সেখানে রঘুনাথ তাঁর অনুবাদিত গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধে মোট পাঁচটি অধ্যায় রেখেছেন। কবি তাঁর কাব্যের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে মূলত অনুবাদ আরম্ভ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে তিনি মঙ্গলাচরণ অংশ রেখেছেন। গ্রন্থারম্ভের

সূচনায় তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

"যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক,

মধ্যাত্মদীপমতিতীর্যতাং তমোহন্ধম্।

সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং

তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্।।"[২৩]

শ্লোকটির অর্থ করলে দাঁড়ায় – এই শ্রীমদ্ভাগবত অত্যন্ত গোপনীয় একটি পুরাণ। এই পুরাণ সমস্ত বেদের সার এবং ভগবৎ-স্বরূপকে অনুভব করায়। সংসারচক্রে আবদ্ধ জীব যারা এই অজ্ঞানান্ধকার থেকে পার হতে চায় তাঁদের কাছে এই গ্রন্থ আধ্যাত্মিক তত্ত্বপ্রকাশক এক অদ্বিতীয় প্রদীপ। আচার্য ব্যাসদেব করুণা পরবশ হয়ে এর বর্ণনা করেছেন। আমি তাঁর শরণ গ্রহণ করলাম। এই শ্লোকটির বাংলা অনুবাদ তিনি করেননি, মূল সংস্কৃত ভাষা বজায় রেখেছেন।

'শ্রীমদ্ভাগবত' পুরাণ আসলে কি-- কবি এখানে সেই কথা বোঝাতেই ভাগবতের শ্লোক গ্রহণ করেছেন। অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবত থেকেই দ্বাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৮তম শ্লোকটি তিনি উদ্ধার করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থে প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি 'নৈমিষারণ্যে শ্রীসূতের কাছে শৌনকের প্রশ্ন' অংশটি রেখেছেন। মূল ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় এটি। যেখানে সূত ও শৌনকাদি অন্যান্য মুনিগণের বিস্তর কথোপকথন রয়েছে। কিন্তু রঘুনাথ মাত্র ১৪টি পংক্তিতে এই অংশটি লিখেছেন। তবুও বলতে হয় যে এই কয়টি মাত্র পংক্তিতেই তিনি শৌনকের কথাবস্তু পরিস্ফুট করতে পেরেছেন। শৌনক সূতের কাছে 'মহাঘোর কলিকাল'-এ জীবের উদ্ধার-এর জন্য 'হরি বিনে' যে নিস্তার নেই সে কথাও প্রকাশিত করেছেন এই কয়েকটি পংক্তির মাধ্যমেই। সবশেষে তিনি সূতের কাছে প্রার্থনা করেছেন ভগবানের স্বরূপ বিস্তারিত ভাবে বলবার জন্য। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায় 'ভগবৎ কথা ও মাহাত্ম্য' থেকে তিনি ২৪টি পংক্তির অনুবাদ করেছেন মাত্র। আর এই কটি পংক্তিতেই তিনি শুকদেবের প্রতি প্রণতি জানিয়েছেন, জীবের পরমধর্ম সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করতে পেরেছেন—

"সেই সে পরম ধর্ম্ম সর্ব বেদে কহে।

যাহা হৈতে হরির চরণে ভক্তি রহে।।

হরিভক্তি হৈলে তত্ত্বজ্ঞান-পরকাশ।

ছিণ্ডয়ে সংসার-পাশ, অবিদ্যা-বিনাশ।।"[২৪]

এই অংশে কবি জানাতে ভোলেন নি যে শুকদেব মহাযোগেশ্বর হবার পরেই অরণ্যে গমন করেন এবং যোগবলে বৃক্ষে প্রবেশ করে বৃক্ষরূপ গ্রহণ করেন।

'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর প্রথম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে 'ভগবান হরির অবতার বর্ণনা' রয়েছে। রঘুনাথ সেই অংশটি তাঁর কাব্যেও প্রথম স্কন্ধে রেখেছেন। এই অধ্যায়ে কবি ভগবানের দ্বাবিংশ 'কল্কি অবতার' পর্যন্তই লিখেছেন। মূল ভাগবতেও দেখি দ্বাদশ অবতারের কথাই বলা আছে। এরপরের অংশে কবি নারদ-ব্যাসের যে কথোপকথন হয়েছিল এই টুকুই শুধু জানিয়েছেন মাত্র দুটি পংক্তির ব্যবহারে—

"তবে আর কথা সূত কহিতে লাগিলা।

যে মতে নারদ-ব্যাস সমাগম হৈলা।।"[২৫]

কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে কথা হয়েছিল তা ভাগবতে অনেক বিস্তৃত ভাবে আছে। সে সব কথা কবি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলে নিয়েছেন। আসলে কবির লক্ষ্য ছিল ভগবানের ঐশ্বর্যলীলার পাশাপাশি মাধুর্যলীলার বর্ণনা। তাই তিনি সেই লক্ষ্যেই এগিয়েছেন এই অধ্যায়গুলি সংক্ষেপিত করে। এর পরেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায় 'মহর্ষি ব্যাসের অপ্রসন্নতা' অংশ কবি অনুবাদ করেছেন। এই অধ্যায় থেকে তিনি ৯টি মাত্র পংক্তি গ্রহণ করেছেন। এই ৯টি পংক্তিতেই বেদের 'চারি ভাগ' ও শাখার কথা বলেছেন কবি। বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন করেও ব্যাসের মনে চিন্তার কারণ হয়েছিল যে, মানুষের মুক্তির জন্য তিনি কিছুই করতে পারেন নি এবং এই চিন্তাতেই তিনি সরস্বতী নদীর তীরে চিন্তামগ্ন হলেন। সেই সময়েই সেখানে নারদ মুনির আগমন হল। কবির কথায়—

"লোক উদ্ধারিতে কৈলা অনেক আয়াস।

তবুও ব্যাসের নহে চিত্তের প্রকাশ।।

সরস্বতী তীরে ব্যাস চিন্তিতে লাগিলা।

হেন কালে নারদ আসি তথাই মিলিলা।।"[২৬]

নারদকে দেখে তখন শিষ্যগণ সহ ব্যাস উঠে বসল এবং আতিথ্য সৎকারের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এরপর কবি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের অংশ এখানে জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু রঘুনাথের বিচক্ষণতার প্রসংশা না করে পারা যায় না। কাহিনির বয়নে তাঁর এই চাতুর্য কাহিনির গতিতে এতটুকুও ব্যাঘাত ঘটায়নি। তিনি আগের অংশে যেখানে ছেড়েছিলেন ঠিক যেন সেই অংশে এসেই মিলিত হয়েছেন। যেখানে নারদ ব্যাস কে চিন্তিত অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন—

"তবে তাঁরে পুছিল নারদ তপোধন।।

কেনে ব্যাস, দেখি তোমার চিন্তিত হৃদয়।[২৭]

তখন ব্যাস উত্তর দিলেন যে, নারদ যে সব কথা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন সবই সঠিক। কিন্তু তার পরেও তিনি হৃদয়ে প্রসন্ন হতে পারছেন না। এর কারণ কি-- ব্যাস তা নির্ধারণ করতে না পেরেই মনে মনে দুঃখিত। তখন তিনি নারদ মুনির স্তুতি করে তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। নারদ মুনি তার উত্তর প্রদান করলেন। কবির কথায়—

"হাসিয়া নারদ তবে দিলেন উত্তর।

আপনে ঈশ্বর হঞা পাসর সকল ।।

দান ব্রত তপ যজ্ঞ কহিলা বিচারি।

হরি সংকীর্ত্তন তুমি না কৈলে বিস্তারি।।

তে কারণে নহে তোমার প্রসন্ন হৃদয়।

আপনে চিন্তিয়া তুমি চাহ মহাশয়।।"[২৮]

এরপরেই নারদ কর্মযোগ উপদেশের অপকারিতার কথা বলেন এবং হরি ভজনে ব্যাসের প্রতি উপদেশ দান করেন। ভাগবতে দেখা যায়, এরপর একটি অধ্যায় রয়েছে 'নারদের পূর্ব জন্ম বিবরণ' নামে। রঘুনাথ তাঁর কাব্যে এখানে কোন অধ্যায় বিভাজন না করে সরাসরি নারদের পূর্ব জন্ম বিবরণের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। মাত্র ১০টি পংক্তিতে কবি এই অংশটি সম্পূর্ণ করেছেন। বাক্য ব্যবহারের সংযম কবির কবিত্ব শক্তিকে প্রকাশ করে। এখানে দেখা যায়-- মাত্র চারটি পংক্তির ব্যবহারে নারদ মুনি তাঁর নিজের পরিচয় প্রদান করেছেন—

"দাসীসুত হঞা কৃষ্ণ দেখিলুঁ সাক্ষাতে।

হরির কিঙ্কর হৈলুঁ বৈষ্ণব প্রসাদে।।

দাসীসূত হঞা পাইলুঁ কৃষ্ণ-দরশন।

তবে জ্ঞান-উপদেশ কৈল নারায়ণ।।"[২৯]

রঘুনাথ প্রথম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে দুটি এবং সপ্তম অধ্যায় থেকে ১৪ টি পংক্তির অনুবাদ করেছেন মাত্র। দেখা যায়, মাত্র দুটি পংক্তির ব্যবহারেই তিনি নারদের অন্তর্ধানের বিষয়টি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' কাব্যে প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে 'ভাগবত' রচনা ও বিস্তারের প্রসঙ্গ। শিষ্য পরম্পরায় ভাগবত কীভাবে বিস্তার লাভ করল মাত্র কয়েকটি পংক্তি ব্যবহারে কবি তা প্রকাশ করেছেন। প্রথমে সত্যবতীসুত ব্যাস ভাগবত রচনা করলেন। তাঁর পুত্র শুকদেব ব্যাসের কাছেই ভাগবত পাঠ করেন। অতঃপর ব্যাস-পুত্র শুকদেব গঙ্গাতীরে রাজা পরীক্ষিতের কাছে গেলেন। সেখানে তিনি রাজা পরীক্ষিৎ-এর কাছে ভাগবত কথা বলেন। শৌনক তখন সূতকে জিজ্ঞেস করেন মহাযোগেশ্বর শুক কেন রাজসন্নিধানে গেলেন ? রাজাকে ব্রহ্মশাপ কে দিলেন ? কেনই বা দিলেন ? এরপরেই সূত ভাগবত আদি থেকে সমস্তই বলে গেলেন। কবির কথায়—

"তবে সূত শুদ্ধচিত্তে, ভাগবত আদি হৈতে,

কহিল সকল মুনি-স্থানে।"[৩০]

পঞ্চম অধ্যায় শুরু হয়েছে শ্রীশৌনক সূত সংবাদে পরীক্ষিতের প্রসঙ্গ দিয়ে। ভাটিয়ারী রাগে তিনি এই অধ্যায় লিখেছেন। শৌনকের করা যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর সূত একে একে বলে গেলেন। এই অংশে ভারতযুদ্ধ প্রসঙ্গ, উত্তরার গর্ভ রক্ষা মাত্র দুটি লাইন ব্যবহার করেই তিনি বললেন। ঘটনা প্রসঙ্গ এখানে কিছু বলেন নি। শুধুমাত্র পাঠককে অবগত করবার জন্যই কবি দুটি চরণের অবতারণা করলেন। মূল ভাগবতে এই অংশে আমরা উত্তরার গর্ভ রক্ষা নামে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় পেয়েছি। কবি লিখলেন—

"প্রথমে ভারতযুদ্ধ সংক্ষেপে কহিল।

যেমত উত্তরাগর্ভ গোবিন্দ রাখিল।"[৩১]

এরপর রঘুনাথ সংস্কৃত ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের নবম অধ্যায় থেকে মাত্র চারটি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন। সেই চারটি শ্লোকের সংখ্যা হল- ১, ২৮, ১০, ৪৩। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, কবি তাঁর কাব্যের কাহিনি পরম্পরা এগিয়ে নিয়ে যেতে মূল ভাগবতের শ্লোকের ক্রম পরিবর্তন করেছেন। এখানে প্রথম শ্লোকের পর আঠাশতম শ্লোক এবং তারপর দশম শ্লোক এবং তারপর তেতাল্লিশতম শ্লোকটি কবি অনুবাদে রেখেছেন। নবম অধ্যায়ে 'ভীষ্মের শরশয্যা' কাহিনি বলার পর কবি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম অধ্যায় 'যুধিষ্ঠিরের অভিষেক ও অশ্বমেধ যজ্ঞ' কাহিনি বলেছেন। মূল ভাগবতে দেখি প্রথমে 'যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও পরে ভীষ্মসমীপে পাণ্ডবগণ' অধ্যায় আছে। কবি এখানে কাহিনি বয়নে সুবিধার জন্য কাহিনির ক্রম পরিবর্তন করেছেন। দেখা যায় যে তিনি মূল ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের মাত্র ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ১৫শ শ্লোক অনুবাদ করেছেন। এরপর তিনি দশম অধ্যায় থেকে মাত্র ৩টি পংক্তি অনুবাদ করেছেন। সেই তিনটি পংক্তি ব্যবহার করেই কবি ভগবানের দ্বারকা বিজয় ও পরীক্ষিতের জন্মের কথা পাঠকগণকে জানিয়ে দিলেন —

"সত্যব্রত প্রভু কৈল সত্যের পালন।

দ্বারকা বিজয় তবে কৈলা নারায়ণ।।

ভাইগণ সঙ্গে রাজা সত্যে রাজ্য পালে।

পরীক্ষিৎ জনম হইলা শুভকালে।।"[৩২]

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য মূল সংস্কৃত ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ের ভাব নিয়ে কিছুই লেখেন নি। এই দুটি অধ্যায় পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে তিনি একেবারে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ করেছেন। তিনি ১৩শ অধ্যায়ের মোট ১২টি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন। এই বারোটি শ্লোকে তিনি বিদুরের তীর্থযাত্রা, ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিসংযোগ ও গান্ধারীর দেহত্যাগ সবটাই অতি সুচারু ভাবে বলে দিয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর দেহত্যাগের সংবাদ শুনে যুধিষ্ঠির শোকে অচেতন হলেন এই কথাও কবি জানাতে ভোলেন নি। তখন সেখানে নারদ উপস্থিত হল এবং ছলে 'কৃষ্ণবিজয়' বুঝিয়ে দিলেন। এখানেই কবির চরিত্র উপস্থাপনার দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে। এরপরেই কবি প্রথম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন। সেখানে 'যদুকুল ক্ষয়' ও শ্রীভগবানের বৈকুণ্ঠ গমন প্রসঙ্গ বলে নিয়েছেন মাত্র দুটি শ্লোকে—

"ব্রহ্মশাপ ছল করি যদুকুল ক্ষয়।

বৈকুণ্ঠনাথের হৈল বৈকুণ্ঠ বিজয়।।"[৩৩]

এখানে একটি বিষয় দেখা যাচ্ছে যে, কবি চতুর্দশ অধ্যায়ের ভাব নিয়েও কিছুই লেখেন নি; এমনকি পঞ্চদশ অধ্যায়ের পর ষোড়শ অধ্যায়ও পরিত্যাগ করে সরাসরি সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদে মনোযোগ দিয়েছেন। 'শ্রীমদ্ভাগবতের' প্রথম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায় 'কলি নিগ্রহ'। কবি মাত্র ৪টি শ্লোকের অনুবাদে এই অধ্যায়ের ভাব বুঝিয়ে দিয়ে অষ্টাদশ অধ্যায় থেকে মাত্র ১টি পংক্তি নিয়েছেন। অতঃপর ঊনবিংশ অধ্যায়ের ৪টি শ্লোকের অনুবাদ করে রাজা পরীক্ষিৎ ও শুকের মিলন দেখিয়ে রঘুনাথ এই স্কন্ধের সমাপ্তি টেনেছেন।

রঘুনাথ কৃত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে মোট দুটি অধ্যায় রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের কাহিনি শুরু করেছেন মূল সংস্কৃত ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ের কাহিনি থেকে শ্লোক নিয়েই। যেখানে শ্রীশুকদেবকে হরিকথা কীর্তন করতে দেখা গেছে। এই অংশটি তিনি ১২ ছত্রে করেছেন। এরপরেই তিনি শ্রীহরিভক্তির শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক রেখেছেন। এখানে কবি সংক্ষেপে অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব ও সাংখ্য যোগের কথাও বলেছেন। ভাগবতের বর্ণনায় দেখা যায়—

"তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবানীস্বরো হরিঃ।

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্।।

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া।

জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ।।"[৩৪]

অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা একান্ত কর্তব্য। জ্ঞান, ভক্তি, অথবা নিজ নিজ আশ্রমধর্ম যথাযথভাবে পালন করে জীবনকে এমনভাবে তৈরী কর যাতে মৃত্যুকালে নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের স্মরণ হয়। কবি অনুবাদে লিখলেন--

"কেহো কৃষ্ণ বোলে কেহো বোলে ব্রহ্মময়।

কেহো স্থূল কেহো সূক্ষ্ম করয়ে নির্ণয়।।

এক কৃষ্ণ নানা মতে নানা শাস্ত্রে কহে।

সে কৃষ্ণ ভজন বিনে পরিত্রাণ নহে।।

সাংখ্য যোগ ধর্ম্ম শাস্ত্র এই অবতরি।

অখিল জন্মের লাভ যদি বোলে হরি।।"[৩৫]

পরক্ষণেই কবি মুক্ত মুনিগণের উপাস্য রূপে এই হরিনামের কথাই বলেছেন। শুকদেব যে নিজের পিতার কাছে ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন এই কথাও আমরা এই অনুবাদ অংশে পেয়েছি। এর পরেই রঘুনাথ 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর দ্বিতীয় স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ করেছেন। এই অধ্যায় থেকে তিনি ৬টি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন মাত্র। তৃতীয় অধ্যায়ে অনুবাদের তিনি অনেকটাই অংশ রেখেছেন। এই অধ্যায়ে দেখা যায় শৌনক মুনি সূতের কাছে প্রশ্ন করেছেন— 'কি কি জিজ্ঞাসিলা রাজা শুকদেব স্থানে ?'[৩৬] এই অধ্যায়ে কবি বলেছেন কৃষ্ণকথা বিনা জীবন নিরর্থক, শ্রীকৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য ঘটে। কৃষ্ণকথার এই তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত করে কবি চতুর্থ অধ্যায় অনুবাদ করেছেন। শৌনক যে প্রশ্ন করেছিল, এই অধ্যায়ের অনুবাদে সূত তার উত্তর প্রদান করেছেন। চতুর্থ অধ্যায় থেকে তিনি ১ম, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ শ্লোকের অনুবাদ করেছেন মাত্র। এই কয়েকটি পংক্তিতেই কবি পরীক্ষিৎ ও শুকের কথোপকথন আলোচনা করেছেন। কবির অনুবাদে পাই--

"তবে সূত কহিতে করিলা অনুবন্ধ।

শুকদেব পরীক্ষিৎ যে হৈল প্রসঙ্গ।।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুকের চরণে।

কিরূপে ভকতি গোসাঞি, হয় নারায়ণে।।

জগতের উৎপত্তি কে করে পালন।

কে করে প্রলয় হেন বিবিধ রচন।।"[৩৭]

এইসব কথার পরেই রঘুনাথ পঞ্চম অধ্যায়ের শ্লোক অনুবাদ করেছেন। এই অধ্যায় থেকে তিনি মোট ৭টি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন। এই অনুবাদে নারদ ও ব্রহ্মার সাক্ষাতের প্রসঙ্গ রয়েছে। নারদ যখন ব্রহ্মার কাছে গেলেন, তখন তিনি দেখলেন ব্রহ্মা ধ্যান-মগ্ন। তখন নারদ বিস্মিত হয়ে নিজের মনেই ভাবতে লাগলেন যে, ব্রহ্মা কি তপ করেন এবং কার ভক্তি করেন ? নারদ তখন ব্রহ্মাকে প্রণাম করে জানালেন যে তাঁর এই রূপ দেখে

তিনি বড়ই ভীত হয়েছেন। ব্রহ্মা নিজেই আদিদেব, জগতের উৎপত্তি হয়ে কিসের জন্য তপ করছেন ? তখন ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুকে জগতের আদি কারণ রূপে নিরূপণ করেন। কবি অনুবাদে লিখেছেন—

"আপনে নারদ হঞা মহা যোগেশ্বর।
তত্ত্ব না জানিয়া বোলে আমাকে ঈশ্বর।।
যাঁহার সৃজিত আমি সৃজিয়ে সংসার।
যাঁহার আজ্ঞায় করি এ লোক বিস্তার।।
সেই সে সভার মূল, বিশ্বের আধার।
প্রলয়ে যাহাতে হয় সকল সংহার।।"[৩৮]

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে কবি মাত্র ৫টি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন। সেই পাঁচটি শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে— ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৪৫, ও ৬৪। এই কয়েকটি শ্লোকে কবি পাঠককে জানিয়ে দিয়েছেন যে ব্রহ্মার মুখে সকল সৃষ্টি কথা আদি থেকে বলা হয়েছে। এরপরেই কবি সপ্তম অধ্যায়ের শ্লোক অনুবাদ করেছেন। এই অংশে কবি ভগবানের বিভিন্ন লীলা অবতারের কথা বলেছেন। কপিলের কাছে দেবহূতি যে তত্ত্বজ্ঞান পেয়েছিল সে কথাও কবি দুটি ছত্রে বলে দিয়েছেন। কিন্তু মূল ভাগবতে দেখা যায় যে, কর্দম ও দেবহূতি বিষয়ে একটি পূর্ণ অধ্যায় আছে, যেখানে তাঁদের পুত্র কপিল মুনি তার মা-কে তত্ত্ব উপদেশ দিচ্ছেন দেখা যায়। এই অধ্যায়ের শেষে কবি ব্রহ্মার মুখে ভাগবত প্রচারের যে বাণী বসিয়েছেন পরোক্ষে তা কবির নিজের মুখেরই বাণী বলে আমাদের মনে হয়--

"ভাগবত নাম এই তত্ত্ব উপদেশ।
আপনে বাঢ়াইহ তুমি করিয়া বিশেষ।।
সুখে যেন তরে লোক এ ভব সংসার।
হরিগুণ গাই যেন ভবে হয় পার।।
এই ভাগবত তুমি বাঢ়াইহ যতনে।
ভাগবত আচার্য কহিল সমাধানে।।"[৩৯]

'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' কাব্যে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য দ্বিতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেছেন শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম অধ্যায় দিয়ে। অষ্টম অধ্যায় থেকে কবি মোট ২২টি শ্লোক অনুবাদ করেছেন। এরপরে নবম অধ্যায় থেকে কবি কয়েকটি শ্লোক অনুবাদ করেছেন। প্রথম যে শ্লোকের অনুবাদ করেছেন সেটি হল পঞ্চম শ্লোক। সেখানে কবি অনুবাদে লিখেছেন হরি যখন 'বিহার করতে' ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন হরির নাভি পদ্ম থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হল। ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করে ভগবান আরও প্রজা সৃষ্টি করতে বললেন। কিন্তু ব্রহ্মা কীভাবে সৃষ্টি কাজ করবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। সেই সময়েই ব্রহ্মা যখন ধ্যানে নিমগ্ন হলেন তখন 'তপ তপ' শব্দ শুনতে পেলেন। মূল ভাগবতে এই অংশটি এভাবে রয়েছে—

"স চিন্তয়ন্ দ্ব্যক্ষরমেকদাম্ভ-
স্যুপাশৃণোদ্ দ্বির্গদিতং বচো বিভুঃ।
স্পর্শেষু যৎ ষোড়শমেকবিংশং
নিষ্কিঞ্চনানাং নৃপ যদ্ ধনং বিদুঃ।।"[৪০]

অর্থাৎ প্রলয়কালীন সমুদ্রের মধ্যে একদিন চিন্তা করতে করতে ব্রহ্মা ব্যঞ্জনবর্ণের ষোড়শ এবং একবিংশতিতম 'ত' এবং 'প' এই দুটি বর্ণ শুনতে পেলেন। কিন্তু ব্রহ্মা যখন শব্দের উৎস কোথায় দেখার চেষ্টা করলেন তিনি কিছুই পেলেন না। তারপরেই ব্রহ্মা সহস্র বৎসর 'তপ' করলেন এবং ভগবান প্রসন্ন হয়ে ব্রহ্মাকে বৈকুণ্ঠ দর্শন করালেন। কবি অনুবাদে লিখেছেন—

"বিহার করিতে ইচ্ছা হইল জখনে।
ব্রহ্মা উতপন্ন হৈলা নাভিপদ্ম হনে।।
সৃষ্টি করিবারে ব্রহ্মা কৈল অবধান।
না জানে কিরূপে হৈব সৃষ্টি নিরমাণ।।
ধ্যান করি ব্রহ্মা মনে চিন্তিতে লাগিলা।
হেনকালে 'তপ তপ'-শব্দ শুনিলা।
কোথা হৈতে উপজিল তপ তপ বাণী।

লখিতে না পাইল তাহা ব্রহ্মা মহামুনি।।"[৪১]

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান ব্রহ্মাকে দর্শন দিয়ে বর চাইতে বললেন। ভগবান বললেন যে, বড় দুঃখে বহুদিন থেকে ব্রহ্মা তপ করেছে। তাই তিনি তুষ্ট হয়ে দিব্যরূপ তাঁকে দেখাবেন। এরপর ব্রহ্মার প্রতি ভাগবত উপদেশ দিয়ে ভগবান অন্তর্হিত হলেন। এরপরেই রঘুনাথ তাঁর অনুবাদে দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায় শুরু করেছেন। যেখানে মহাপুরাণের দশ লক্ষণের কথা তিনি সংক্ষেপে করেছেন। মূল ভাগবতে এই অংশ অনেক বিস্তৃত। কিন্তু কবির অনুবাদ মাত্র কয়েকটি পংক্তি—

"সর্গ বিসর্গ আর স্থানাস্থান পোষণ।

কর্ম্মবশে নানা মন্বন্তর বিবরণ।।

ঈশ্বর চরিত্র মুক্তি প্রলয় আশ্রয়।

দশবিধ কহিল লক্ষণ পরিচয়।।"[৪২]

এইটুকু বলে নিয়েই কবি প্রাকৃত স্বর্গ-বিস্তার বর্ণনা করেছেন কয়েকটি শ্লোকে। এরপরেই মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদের মূল কারণ কয়েকটি পংক্তিতে অনুবাদ করেছেন।

সংস্কৃত 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর তৃতীয় স্কন্ধে মোট অধ্যায় আছে ৩৩টি। রঘুনাথ তাঁর অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'-তে তৃতীয় স্কন্ধে অধ্যায় রেখেছেন মোট ৯টি। পাণ্ডবদের ওপর কৌরবগণের অত্যাচারের প্রসঙ্গ দিয়ে কবি প্রথম অধ্যায় শুরু করেছেন। যেখানে কবি খুব সংক্ষেপে বলেছেন যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এক কুপুত্র ছিল। সে যা মনে ইচ্ছে হত তাই করত। একদা পঞ্চপাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার জন্য তাঁদের 'জৌঘরে' রাখা হল। কপট পাশাখেলায় হারিয়ে তাঁদের সমস্ত রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হল। দ্রৌপদীকে সভায় সবার সম্মুখে অপমান করা হল। সবশেষে মন্ত্রণা করার জন্য বিদুরকে ডাকা হল। বিদুর সেখানে এসে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। কবির ভাষায়—

"কহিতে লাগিলা তবে বিদুর সুমতি।

কহিব তোমারে রাজা কর অবগতি।।

যুধিষ্ঠির তরে দেহ অর্দ্ধ রাজ্যখণ্ড।

দুই ভাই ভীমার্জ্জুন মহা পরচণ্ড।।

কৃষ্ণ তার সহায় অখিল লোকপতি।

তার সঙ্গে ছাড় রাজা বিবাদ জুগতি।।

কুলাঙ্গার দুর্যোধন আছে নিজ পুরে।

এ বড় বিষম দোষ দেখিয়ে তোমারে।।"[৪৩]

বিদুরের এই সব কথা শুনেই দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বিদুরকে ভর্ৎসনা করে তাকে দাসীর ছেলে বলে গালাগাল করে এবং তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিতে বলা হল। এই অংশ মূল ভাগবতেও রয়েছে। কবি তাঁর অনুবাদেও রেখেছেন কিন্তু সংক্ষেপে। এই অংশের পরে কবি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় 'বিদুর-উদ্ধব মিলন' অংশ অনুবাদে রেখেছেন। তৃতীয় অধ্যায় থেকে অনুবাদ করেছেন ১৭টি শ্লোক। এরপর চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম অধ্যায়, ষষ্ঠ অধ্যায় অনুবাদ করে তিনি তাঁর কাব্যে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করেছেন। এরপর রঘুনাথ দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেছেন 'শ্রীমদ্ভাগবতের' সপ্তম অধ্যায়ের অংশ নিয়ে। এই অংশে মাত্র ৮টি পংক্তির অনুবাদে কবি শ্রীভগবানের ভগবদ অবতারের কথা বলেছেন। তারপরই অষ্টম অধ্যায় 'ব্রহ্মা ও শ্রীসনকাদি মুনির ভাগবত শ্রবণ' অংশ। নবম অধ্যায় থেকে মাত্র দুটি পংক্তি, দশম অধ্যায় থেকে একটি, একাদশ থেকে একটি, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ থেকে কয়েকটি করে শ্লোক নিয়ে তিনি এই অধ্যায় সমাপ্ত করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায় শুরু করেছেন চতুর্দশ অধ্যায়ের 'হিরণ্যাক্ষ যুদ্ধকারণ' অংশ দিয়ে। হিরণ্যাক্ষ কেন যুদ্ধ করেছিল ? বিদুরের এই প্রশ্নের উত্তরে উদ্ধব দিতির গর্ভে অসুর উৎপত্তির কারণ বর্ণনা করেছেন। মৈত্রেয় বিদুরকে জানায় যে, দক্ষ কন্যা দিতি একদিন পুত্রলাভের ইচ্ছায় কামাসক্ত হয়ে নিজ স্বামী কশ্যপকে কাছে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঋষি কশ্যপ জানান যে, সেই সময় স্ত্রীসঙ্গ লাভের সময় নয়। সেই সময় ছিল রাক্ষসী বেলা। ভগবান শিবের অনুচর তখন ঘুরে বেড়ায়। দিতি কামবাসনা চরিতার্থ করতে গিয়ে পতির আদেশ অমান্য করেছিলেন এবং দেবতাদেরও অবহেলা করেছিলন। তাই কশ্যপ জানান, এই অপরাধের জন্য দিতির গর্ভে ২ জন অসুর পুত্র জন্ম নেবে। কবির অনুবাদে পাই—

"দিতি নামে কশ্যপের আছিল বনিতা।

দৈত্যের জননী তিঁহো দক্ষের দুহিতা।।

.....

সন্ধ্যাকালে গেলা তেঁহো কশ্যপের স্থানে।

পুত্রকামে রতিকেলি মাগিল চরণে।।

কশ্যপ বিস্তর তাঁরে কৈল নিবারণ।

এখনে উচিত নহে স্ত্রীর সম্ভাষণ।।"[৪৪]

কিন্তু কামে বিমোহিত দিতি এসব কথার কিছুই বুঝতে পারেন না। তখন কশ্যপ নিতান্তই অদৃষ্ট মেনে নিয়ে সম্মতি দিলেন। এর পরেই হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। এই কাহিনি দিয়েই এই অধ্যায় শেষ করেছেন কবি।

চতুর্থ অধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের 'চতুঃসনের শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন' অংশ থেকে শুরু হয়েছে। ভাটিয়ারী রাগে কবি এই অধ্যায়টি লিখেছেন। সনক, সনাতন, সনৎকুমার ও সনন্দ এই চারজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার কাছে গেলে ব্রহ্মা তাঁদের জানান যে, জয়-বিজয় অসুর শরীর লাভ করে দিতির গর্ভে জন্ম লাভ করবে। তোমরা এটাতে কোন ভয় পেও না। এই অংশেই কবি চতুঃসনের প্রতি জয়-বিজয়ের অপরাধের প্রসঙ্গের কথা বলেছেন। এরপরেই ষোড়শ অধ্যায়ের জয়-বিজয়ের বৈকুণ্ঠ থেকে পতন অংশ বর্ণিত হয়েছে। ষোড়শ অধ্যায় থেকে কবি ৭টি মাত্র শ্লোক অনুবাদ করেছেন। এই কটি মাত্র শ্লোকের অনুবাদেই কবি তাঁর বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করেছেন। কবির অনুবাদ—

"চারি মহা যোগেশ্বর, উঠিলা বৈকুণ্ঠ পর,

যায় পুর পরবেশ করি।

দুই পারিষদ বর, বিষ্ণু সমবেশ ধর,

রাখিল দুয়ারে বেত্র ধরি।।

দীপ্ত হুতাশন জিনি, কোপ কৈল চারি মুনি,

তা সভাকে শাপিল বচনে।"[৪৫]

এরপর তিনি মূল ভাগবতের সপ্তদশ অধ্যায় নিয়ে তাঁর কাব্যে পঞ্চম অধ্যায় শুরু করেছেন। এখানে তিনি দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জয়-বিজয়ের জন্ম কথা অনুবাদ

করেছেন। এই অংশের অনুবাদে দেখা যায় কবি মাত্র ৩টি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন। সেই শ্লোক সংখ্যা হল ২, ১৮, ১৯। মূল ভাগবতে আছে—

শ্লোক ২ "দিতিস্তু ভর্তুরাদেশাদপত্যপরিশঙ্কিনী।
পূর্ণে বর্ষশতে সাধ্বী পুত্রৌ প্রসুষুবে যমৌ।।

শ্লোক ১৮ তং বৈ হিরণ্যকশিপুং বিদুঃ প্রজা
যং তং হিরণ্যাক্ষমসূত সাগ্রতঃ।।

শ্লোক ১৯ চক্রে হিরণ্যকশিপুর্দোর্ভ্যাং ব্রহ্মবরেণ চ।
বশে সপালাল্লোঁকাংস্ত্রীনকুতোমৃত্যুরুদ্ধতঃ।।"[৪৬]

অর্থাৎ-- দিতি তাঁর পতির কথামতো পুত্রদের দ্বারা উপদ্রবের আশঙ্কা মনের মধ্যে পোষণ করে চলছিলেন। শেষে যখন শত বছর পার হল তখন সেই সাধ্বী রমণী দুটি যমজ সন্তান প্রসব করলেন। দুজনের মধ্যে যে প্রথমে উৎপন্ন হল লোকে তাকে হিরণ্যকশিপু বলে জানল আর অন্যজনের নাম হিরণ্যাক্ষ। ব্রহ্মার বরে মৃত্যুভয় মুক্ত হওয়াতে হিরণ্যকশিপু বড় উদ্ধত হয়ে উঠেছিল। নিজের বাহুবলে সে ত্রিলোককে নিজের বশে এনে ফেলল। কবির অনুবাদে পাই—

শ্লোক ২ "দিতিও ধরিল গর্ভ শতেক বৎসর।
প্রসব হইল তবে অপত্য যুগল।।

শ্লোক ১৮ হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম।
তার সনে কেহ নাহি করিতে সংগ্রাম।।

শ্লোক ১৯ ধরিয়া বরাহ রূপ আপনে শ্রীহরি।
পৃথিবী উদ্ধার কৈল হিরণ্যাক্ষ মারি।।"[৪৭]

শ্রীমদ্ভাগবতের ঊনবিংশ অধ্যায় থেকে রঘুনাথ মাত্র দুটি শ্লোক অনুবাদ করেছেন। বিংশ অধ্যায় থেকে করেছেন ৭টি। এই শ্লোকগুলির অনুবাদে তিনি স্বায়ম্ভুব মনুর চরিত্র বর্ণনা করেছেন। এরপর একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ করেছেন কবি। যেখানে মহর্ষি কর্দমের প্রতি শ্রীহরির কৃপা ও স্বায়ম্ভূব মনু কর্তৃক কর্দম ঋষিকে নিজ কন্যা দান কাহিনি

রয়েছে। স্বায়ম্ভুব মনুর স্ত্রী যে শতরূপা তা কবি জানাতে ভোলেন নি এবং তাঁদের দুই পুত্র ও তিন কন্যা একথাও কবি বলেছেন। ব্রহ্মার পুত্র কর্দম মুনি সহস্র বৎসর তপস্যা করে জগন্নাথের বর লাভ করেছিলেন যে, স্বায়ম্ভুব নিজ কন্যা দেবহূতিকে বিনয় সহকারে তার হাতে দান করবেন। এরপরেই দ্বাবিংশ অধ্যায় অনুবাদ করেছেন কবি। এই অধ্যায় থেকে তিনি ৬টি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন। মূল ভাগবতে এই অধ্যায়ের নাম আছে 'কর্দম দেবহূতির রতিক্রীড়া'। কিন্তু কবি অনুবাদে নাম রেখেছেন—দেবহূতির পাতিব্রত্য। 'রতিক্রীড়া' শব্দটি কবির কাছে অভিপ্রেত মনে হয়নি। এই অধ্যায়ে কর্দম নির্মিত দিব্য রথের বর্ণনা ও কর্দম দেবহূতির বিহার বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর নব কন্যা লাভের পরে কর্দম মুনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে যখন চলে যাবার উপক্রম করলে দেবহূতি পুত্র লাভের জন্য কর্দমের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা জানায়। তখন পত্নীর হৃদয় বুঝতে পেরে মহর্ষি কিছুদিন সেখানে অবস্থান করলেন। এরপর শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্বিংশ অধ্যায় শ্রীদেবহূতির গর্ভে মহর্ষি কপিলদেবের জন্ম কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

রঘুনাথ তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' কাব্যের তৃতীয় স্কন্ধ ষষ্ঠ অধ্যায় লিখেছেন মূল সংস্কৃত ভাগবতের ২৫তম অধ্যায়, ২৬তম অধ্যায়, ২৭তম অধ্যায়, ২৮তম অধ্যায়, ২৯তম অধ্যায়, ৩০তম অধ্যায় থেকে কাহিনি চয়ণ করে। পঁচিশতম অধ্যায় থেকে তিনি মোট ২৯টি, ছাব্বিশতম অধ্যায় থেকে মোট ৪টি, সাতাশতম অধ্যায় থেকে মোট ১১টি, আটাশতম অধ্যায় থেকে মোট ১০টি, ঊনত্রিশ অধ্যায় থেকে মোট ১৪টি, ত্রিশ অধ্যায় থেকে মোট ৩১ টি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেবহূতি তত্ত্বোপদেশ প্রার্থনা করেছেন কপিল মুনির কাছে। এরপর কপিল মুনি সাধুসঙ্গে শ্রীহরি ভজনার্থোপদেশ, শুদ্ধভক্তিলাভের উপায় বর্ণন, সাংখ্যযোগের রহস্য প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। সংস্কৃত ভাগবতের ২৬তম অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের উৎপত্তি বর্ণনা রয়েছে। কবি রঘুনাথ মাত্র ৪টি শ্লোকের অনুবাদে এই অধ্যায়ের কথাবস্তু ব্যক্ত করেছেন। ২৭তম অধ্যায়ের অনুবাদে তিনি বন্ধনের কারণ ও মোক্ষলাভের বর্ণনা করেছেন। ভাগবতের ২৮তম অধ্যায়ে 'অষ্টাঙ্গ যোগের বিবরণ' অনুবাদ করেছেন কবি। রঘুনাথ এই অধ্যায়ের অনুবাদেই যোগের বিবরণ অনুবাদ করেছেন। ৩০তম অধ্যায়ের অনুবাদে আমরা কাহিনির ক্রম পরিবর্তন হতে দেখেছি। এই অংশে তিনি প্রথমে অষ্টম শ্লোকের অনুবাদ করে মাঝের নবম শ্লোক ব্যতিরেকে ১০ম শ্লোকের অনুবাদ করেছেন। তারপর তিনি নবম শ্লোকের অনুবাদ করেছেন। কবির অনুবাদে পাই—

শ্লোক ৮-১০ "নানা পাপ করি করে ধন উপার্জ্জন।
নানা দুঃখ তাপে করে কুটুম্ব পোষণ।।
শ্লোক ৯ দুঃখ নিবারণ হেতু নানা কর্ম্ম করে।
সেই সেই সুখ হেন তার চিত্তে ধরে।।"[৪৮]

তৃতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একত্রিশ অধ্যায়ের কাহিনিকে কেন্দ্র করেই কবি লিখেছেন। ভাগবতের ৩১ তম অধ্যায়ে নরযোনি প্রাপ্তি রূপের প্রসঙ্গ আছে। কবি তার কাব্যে গর্ভবাস বর্ণন হিসেবে তা অনুবাদ করেছেন। রঘুনাথের বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় আমরা এই অংশের অনুবাদের থেকে পাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩২ তম অধ্যায় ঊর্ধ্বগতি ও পুনর্জন্ম অধ্যায় অবলম্বনে কবি অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ করেছেন। কবি বলেছেন— শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতিই সর্বমঙ্গলের হেতু। এই অংশেই ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণে অযোগ্য ও যোগ্য জনের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন কবি। এরপরেই খুব স্বল্প পরিসরে ৩৩ তম অধ্যায় অবলম্বন করে কবি তাঁর কাব্যে নবম অধ্যায় লিখেছেন। যেখানে দেবহূতির মোহনাশ ও তত্ত্বজ্ঞানলাভ প্রসঙ্গ কবি রেখেছেন।

'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর চতুর্থ স্কন্ধে মোট অধ্যায় আছে ৩১টি। কিন্তু রঘুনাথ তাঁর অনুবাদিত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'তে অধ্যায় রেখেছেন মোট ৮টি। তাঁর কাব্যের চতুর্থ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে একটি সংস্কৃত শ্লোক রয়েছে। এরপর কবি প্রথম অধ্যায় শুরু করেছেন। মূল ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ে মনু কন্যাদের বংশ বর্ণনা আছে। রঘুনাথের প্রেমতরঙ্গিণীতেও প্রথম অধ্যায় মনু দুহিতাদের বংশ বিস্তার। ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় থেকে কাহিনি নিয়ে রঘুনাথ তাঁর কাব্যের প্রথম অধ্যায় লিখেছেন। যেখানে মনু কন্যাদের বংশ, ভগবান শিব এবং দক্ষের বিদ্বেষের বর্ণনা, দক্ষ যজ্ঞ, দক্ষ যজ্ঞে গমনের জন্য দেবীর আকাঙ্ক্ষা, সতীর অগ্নিপ্রবেশে দেহত্যাগ, দক্ষপুরে শৈবজ্বরের উৎপাত, বিষ্ণুর দক্ষ যজ্ঞ সমাপন প্রতিটি অধ্যায়ের কিছু কিছু শ্লোকের অনুবাদ কবি করেছেন।

চতুর্থ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছে ভাগবতের অষ্টম অধ্যায়ের কাহিনি দিয়ে। যেখানে ধ্রুবের জন্ম ও শৈশবে বিমাতার ভর্ৎসনা বর্ণনা করা হয়েছে। কবি এই অধ্যায়টি লিখেছেন অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে। আমরা দেখি কাহিনির ক্রমান্বয়ে গতি আনতে তিনি কাহিনির ক্রম পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। অষ্টম অধ্যায়ে

ধ্রুবের বনগমন কাহিনি বলার পর দশম অধ্যায়ের চারটি পংক্তি অনুবাদ করে ধ্রুবের বিবাহ প্রসঙ্গ বলেছেন। তারপর আবার নবম অধ্যায়ের ধ্রুবের রাজ্যলাভ প্রসঙ্গ বলেছেন চারটি শ্লোকের অনুবাদে। এরপর দশম স্কন্ধের কয়েকটি শ্লোক অনুবাদ করে কবি ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ 'গন্ধর্বগণের সহিত ধ্রুবের যুদ্ধ এবং মনুর উপদেশে যুদ্ধ বিরতি' বর্ণনা করেছেন। অতঃপর দ্বাদশ অধ্যায় ধ্রুবের বিষ্ণুধামে গমন অংশ রয়েছে।

চতুর্থ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় লিখেছেন শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়, পঞ্চদশ অধ্যায়, ষোড়শ অধ্যায়, সপ্তদশ অধ্যায় এবং অষ্টাদশ অধ্যায় থেকে কাহিনি নিয়ে। কবি ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে যে শ্লোকগুলি অনুবাদ করেছেন সেগুলি হল—১, ২, ৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৭, ১৮ তম শ্লোক। এই শ্লোকগুলি অনুবাদ করে কবি ধ্রুববংশ বর্ণনা, দুষ্ট বেণ রাজার চরিত্র বর্ণনা করেছেন। চতুর্দশ অধ্যায় থেকে প্রথম দিকের ৫ম, ৬ষ্ঠ, এবং ১৩ নং শ্লোক অনুবাদ করে ২৩, ২৮, ৩০, ৩৫, ৩৯, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬তম শ্লোক অনুবাদে রেখেছেন কবি। এই শ্লোকগুলির ব্যবহারে তিনি মুনিগণের অভিশাপে বেণের বিনাশ কাহিনি বলেছেন। এরপর পঞ্চদশ অধ্যায়ে পৃথুর উৎপত্তি ও রাজ্যাভিষেক অংশ অনুবাদ করেছেন। ষোড়শ অধ্যায়ে কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করে পৃথুর বংশ বর্ণনা করেছেন কবি। তারপর পৃথুর সুশাসন, পৃথুর ঐশ্বর্য দর্শনে ইন্দ্রের মাৎসর্য্য, ইন্দ্রের দমনে পৃথুর চেষ্টা প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুসরণে। অষ্টাদশ অধ্যায় থেকে তিনি শুধু পৃথিবী দোহন ও পৃথ্বীতল সমীকরণের অংশটুকু গ্রহণ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি ঊনবিংশ অধ্যায়, বিংশ অধ্যায়, দ্বাবিংশ অধ্যায় ও ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের কাহিনি রেখেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায় 'মহারাজ পৃথু কর্তৃক নিজ প্রজাদের উপদেশ দান' তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করেছেন দেখা যায়। ঊনবিংশ অধ্যায় 'মহারাজ পৃথুর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ইন্দ্রবধোদ্যত পৃথুকে ব্রহ্মার নিবারণ' অংশ তিনি মাত্র ১১টি শ্লোকের অনুবাদে করেছেন। বিংশ অধ্যায় 'পৃথুকে বিষ্ণুর উপদেশ' মাত্র ৫টি শ্লোকের অনুবাদে সম্পূর্ণ করেছেন। এরপর একবিংশ অধ্যায়ের কোন শ্লোকের অনুবাদ না করে তিনি দ্বাবিংশ অধ্যায় 'পৃথুকে সনৎকুমারের উপদেশ' ও ত্রয়োদশ অধ্যায় পৃথুর বৈকুণ্ঠে গমন অংশ অনুবাদ করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায় শুরু করেছেন শ্রীমদ্ভাগবতের চব্বিশতম অধ্যায় থেকে কাহিনি নিয়ে। শ্রীমদ্ভাগবতের ২৪তম অধ্যায় 'প্রচেতাগণের প্রতি ভগবান রুদ্রের উপদেশ' অংশ থেকে তিনি তার অনুবাদে কয়েকটি শ্লোক নিয়েছেন। এই অধ্যায় থেকে ১, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০,

১৩, ১৪, ১৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৫৯, শ্লোকের অনুবাদ করেছেন মাত্র। এরপর ২৫তম অধ্যায় 'পুরঞ্জনের উপাখ্যান' অনুবাদ করেছেন কবি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে কাহিনি গঠন করা হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতের ২৬, ২৭ ও ২৮তম অধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে। ২৬ অধ্যায় 'পুরঞ্জনের মৃগয়া গমন ও মহিষীর কোপ'। এই অধ্যায়ে রঘুনাথ অল্প কিছু শ্লোকে পুরঞ্জনের বনে গমন, পশু বধ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে তাঁর পত্নীর মান ভঞ্জনের সুন্দর অনুবাদ করেছেন। যেখানে দেখা যায়, পুরঞ্জন তার স্ত্রীকে মৃগয়ায় না নিয়ে যাবার জন্য তিনি ক্রোধবসত ভূমিতে শয়ন করেছিলেন। পুরঞ্জন দাসীর কাছে খবর শোনা মাত্রই তার কাছে ছুটে যান এবং তার অভিমান খণ্ডনের চেষ্টা করেন। এরপর চণ্ডবেগ কর্তৃক পুরঞ্জনপুরী আক্রমণ এবং কালকন্যার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে শুধুমাত্র 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর ঊনত্রিশ অধ্যায়-এর কাহিনি গ্রহণ করেছেন কবি। ভাগবতের ঊনত্রিশ অধ্যায়ে আছে পুরঞ্জন পুরের ব্যাখ্যা। অষ্টম অধ্যায়ের কাহিনি তিনি গ্রহণ করেছেন চতুর্থ স্কন্ধের ত্রিশ অধ্যায় ও একত্রিশ অধ্যায় থেকে। ত্রিশ অধ্যায়ে 'প্রচেতাগণকে বিষ্ণুর বরদান' অংশ রয়েছে। এই অংশে দেখা যায় প্রচেতাগণ শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করার জন্য দশহাজার বৎসর তপস্যা করেছেন। তখন শ্রীহরি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের বর চাইতে বললে তারা যতদিন সংসারে ভ্রমণ করবে ততদিন শ্রীহরির প্রেমিক ভক্তদের সঙ্গ প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবান শ্রীহরি তাঁদের কাঙ্খিত বর প্রদান করেছিলেন। একত্রিশ অধ্যায়ে আছে প্রচেতাগণের প্রতি নারদের উপদেশ এবং প্রচেতাগণের মুক্তিলাভ। এই অধ্যায়ে প্রচেতাগণ দেবর্ষি নারদের কাছে পরমতত্ত্ব বিষয়ে জানতে চেয়েছিল। রঘুনাথ একত্রিশ অধ্যায় থেকে ২৪, ২৬, এবং ৩১ এই তিনটি মাত্র শ্লোকই অনুবাদ করেছিলেন। এখানে ১০ জন প্রচেতাগণের শ্রীহরি ভজনার কথা রয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে অধ্যায় আছে ২৬টি। রঘুনাথ তাঁর কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'তে রেখেছেন ৮টি অধ্যায়। পঞ্চম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে তিনি মূল ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় 'মহারাজ প্রিয়ব্রতের চরিতকথা' অংশ থেকে শুরু করেছেন। তারপর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে 'আগ্নীধ্র চরিত্র' বর্ণনা করেছেন মাত্র ১৪টি পংক্তির মাধ্যমে। তৃতীয় অধ্যায় রাজা নাভির উপাখ্যান থেকে তিনি ১, ২, ১৭, ১৮, ১৯ সংখ্যক শ্লোক অনুবাদ করেছেন মাত্র। এরপর পঞ্চম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায় নাভির পুত্র ঋষভের চরিত্র বর্ণনা করেছেন কবি। ভাগবতের পঞ্চম অধ্যায়ে পুত্রদের প্রতি ঋষভদেবের উপদেশ এবং নিজের অবধূতবৃত্তি গ্রহণের কথা আছে। সেই অধ্যায় থেকে রঘুনাথ বেশ কিছুটা অংশ

অনুবাদ করেছেন। এখানে একটি বিষয় দেখা যায় যে, ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় 'ঋষভদেবের দেহত্যাগ' তিনি পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন। এই অধ্যায় বাদ দিয়ে সপ্তম অধ্যায়ের কাহিনিকে নিয়ে তিনি তাঁর কাব্যে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেছেন। এই অধ্যায় ভাগবতের অন্য যেসব অধ্যায়ের কাহিনি নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল—অষ্টম অধ্যায় এবং নবম অধ্যায়। অষ্টম অধ্যায়ে ভরতের মৃগদেহ প্রাপ্তির এবং নবম অধ্যায়ে ভরতের জড়-ব্রাহ্মণ জন্ম বর্ণনা করেছেন কবি।

তৃতীয় অধ্যায়ে ভাগবতের দশম অধ্যায়ের কাহিনি জড়-ভরত এবং রহুগণ রাজার সংবাদ বিবৃত হয়েছে। পালকি-বাহক হিসেবে শ্রীভরতের নিয়োগ এবং সর্বশেষে তার প্রকৃত পরিচয় লাভে রাজা কর্তৃক ভরতের স্তুতি বর্ণিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। চতুর্থ অধ্যায়ে আছে মূল সংস্কৃত ভাগবতের একাদশ অধ্যায় ও দ্বাদশ অধ্যায়ের কাহিনি। একাদশ অধ্যায়ে আছে রাজা রহুগণের প্রতি ভরতের উপদেশ দান এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে আছে ভরতমুনি কর্তৃক রহুগণের সন্দেহ ভঞ্জনের কাহিনি। এই দুটি অধ্যায় থেকে কিছু সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদ করে কবি চতুর্থ অধ্যায় লিখেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে ভাগবতের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কাহিনি ভরতের সংসার বর্ণনা ও রহুগণের সংশয় মোচন। ষষ্ঠ অধ্যায় লিখেছেন পঞ্চম স্কন্ধ চতুর্দশ অধ্যায় সংসার অরণ্যের ব্যাখ্যা কাহিনি অবলম্বনে। সপ্তম অধ্যায়ে আছে মূল ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের কাহিনি ভরতের বংশ বর্ণনা। এরপর কবি অষ্টম অধ্যায় শুরু করেছেন ২৬তম অর্থাৎ শেষ অধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে। এর আগের ১৬তম অধ্যায় ভুবনকোষের বর্ণনা, ১৭তম অধ্যায় গঙ্গার বিবরণ, ১৮তম অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ষ বর্ণন, ১৯তম অধ্যায় ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন, ২০ তম অধ্যায় লোকালোক পর্বতের অবস্থান, ২১ তম অধ্যায় 'সূর্যের রাশিচক্রে ভ্রমণ', ২২ তম অধ্যায় 'জ্যোতিশচক্রে চন্দ্রের অবস্থান', ২৩ তম অধ্যায় 'ধ্রুবলোক ও শিশুমার জ্যোতিশচক্রে অবস্থিতি' প্রভৃতি অধ্যায় অনুপস্থিত। ষড়বিংশ অধ্যায়ে আছে 'নরকের ভিন্ন ভিন্ন গতির কথা' যা, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে অনুপস্থিত।

'শ্রীমদ্ভাগবত' মহাপুরাণ গ্রন্থের ষষ্ঠ স্কন্ধে অধ্যায় আছে মোট ১৯টি। কিন্তু রঘুনাথ 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' কাব্যগ্রন্থে ষষ্ঠ স্কন্ধে অধ্যায় রেখেছেন মোট তিনটি। প্রথম অধ্যায়ের সূচনায় কবি 'পদ্যাবলী'র নাম মাহাত্ম্যমূলক ২০ সংখ্যক শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন। তারপর ৬ষ্ঠ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়– অজামিলের উপাখ্যান অংশ অবলম্বনে লিখিত। দ্বিতীয় অধ্যায় বিষ্ণুদূতগণ দ্বারা ভাগবত ধর্ম নিরূপণ এবং অজামিলকে বিষ্ণুলোকে আনয়ন। তৃতীয়

অধ্যায়ের 'যমরাজের বৈষ্ণবধর্ম বর্ণনা' অংশও তিনি রেখেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেছেন মূল ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায় 'দক্ষের শ্রীহরি আরাধনা' অধ্যায় থেকে কাহিনি নিয়ে। পঞ্চম অধ্যায়ে নারদের উপদেশে দক্ষ পুত্রদের বৈরাগ্য এবং নারদকে দক্ষের অভিশাপ অংশ রয়েছে। দক্ষের নির্দেশে তার পুত্ররা একদা তপোবনে যায় প্রজা সৃষ্টি করার জন্য। নারদ পথে এসে তাঁদের উপদেশ দিল পৃথিবী পর্যটন করে পরে সৃষ্টিধর্ম পালন করতে। নারদের বচনে সকলেই পৃথিবী পর্যটনে গেল। দক্ষ তাঁদের জন্য শোকগ্রস্ত হয়ে পুনরায় এক হাজার পুত্র সৃষ্টি করেছিলেন। দক্ষের আদেশে যখন তারা তপস্যায় মগ্ন হতে গিয়েছিলেন তখন নারদ পুনরায় তাঁদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট করেছিলেন। এই কথা শুনে দক্ষ নারদকে অভিশাপ দিয়েছিলেন –

"সাপিব তোমাকে আমি কে রাখিতে পারে।
নিরবধি জগতে ভ্রমিহ একেশ্বরে।।
একদিন এক স্থানে নহে মন স্থিতি।
স্বীকার করিয়া নৈল মুনি মহামতি।।"[৪৯]

এরপর ষষ্ঠ অধ্যায় 'দক্ষ কন্যাগণের বংশ বর্ণনা' অংশ তিনি অনুবাদে রেখেছেন। এরপর ষষ্ঠ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায় 'বৃহস্পতির দেব পৌরহিত্য ত্যাগ' কাহিনি তিনি কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। অষ্টম অধ্যায়ের 'নারায়ণ কবচের উপদেশ এবং দানব বিজয়' অধ্যায় থেকে তিনি মাত্র ৩টি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন। সেই তিনটি শ্লোকেই তিনি ইন্দ্রের নারায়ণ কবচ ধারণ ও অসুর জয়ের কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন। নবম অধ্যায় বিশ্বরূপ বধ ও বৃত্রাসুরের উৎপত্তির কথা আছে। দশম অধ্যায়ের দধীচি মুনির উদারতা ও ইন্দ্র বৃত্রাসুর যুদ্ধও কবি বর্ণনা করেছেন। একাদশ অধ্যায়ের বৃত্রাসুরের বীরবাণী ও ভগবৎ প্রাপ্তি প্রার্থনা অধ্যায় থেকে তিনি মোট ৯টি পংক্তি অনুবাদ করেছেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, তিনি একাদশ অধ্যায় অনুবাদের পর দ্বাদশ অধ্যায় ইন্দ্রের বৃত্রবধ অনুবাদ না করে ত্রয়োদশ অধ্যায় 'ইন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ সাধন' অনুবাদ করেছেন এবং তারপরের অংশে তিনি দ্বাদশ অধ্যায় অনুবাদ করে পুনরায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কিয়দংশ অনুবাদ করেছেন।

'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' কাব্যে ষষ্ঠ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের কাহিনি কবি নিয়েছেন মূল ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায় 'চিত্রকেতুর শোক' থেকে। ভাগবতের পঞ্চদশ

অধ্যায় 'চিত্রকেতুকে দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি অঙ্গিরার উপদেশ' তিনি অনুবাদে রাখেননি। কিন্তু মাত্র দুটি পংক্তি ব্যবহার করে তিনি পাঠককে জানিয়েছেন যে, দুই মুনির সেখানে আগমন ঘটল—

"এইরূপে কান্দে রাজা শোকে অচেতন।

হেনকালে দুই মুনি কৈল আগমন।।"[৫০]

এরপরেই ষোড়শ অধ্যায় চিত্রকেতুর বৈরাগ্য ও নারদের দ্বারা তাঁকে সঙ্কর্ষণ মন্ত্রদানের প্রসঙ্গ অনুবাদ করেছেন কবি। ১৮তম অধ্যায় অদিতি ও দিতির সন্তানগণের এবং মরুৎগণের উৎপত্তি বর্ণনা, ১৯তম অধ্যায় পুংসবন ব্রতের কথা এই অধ্যায়ে আলোচনায় জায়গা পায়নি।

ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে অধ্যায় আছে ১৫টি। রঘুনাথ তাঁর কাব্যে অধ্যায় রেখেছেন ৫টি। প্রেমতরঙ্গিণী কাব্যে সপ্তম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ে তিনি কাহিনি চয়ন করেছেন মূল ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় থেকেই। সপ্তম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ে আছে জয়-বিজয়ের কাহিনি। তারপর দ্বিতীয় অধ্যায়ে হিরণ্যাক্ষ বধের পর হিরণ্যকশিপু কর্তৃক মাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের সান্ত্বনাদান অধ্যায়, অতঃপর তৃতীয় অধ্যায় হিরিণ্যকশিপুর তপস্যা ও বরলাভ। চতুর্থ অধ্যায় হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার এবং প্রহ্লাদের গুণের বর্ণনা অধ্যায়ের অর্ধেক অংশ এই প্রথম অধ্যায়ে রেখে বাকি অর্ধেক অংশ দিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছেন কবি। এই অংশে ৪৪, ৪৫, ৪৬ শ্লোকের অনুবাদ রয়েছে মাত্র। ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ বধের প্রয়াস অংশ অনুবাদ করেছেন কবি। অতঃপর ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'অসুর বালকদের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ' অংশ অনুবাদে রেখেছেন। সপ্তম অধ্যায় মার্তৃ গর্ভস্থিত প্রহ্লাদকে নারদের উপদেশ, অষ্টম অধ্যায় নৃসিংহ ভগবানের আবির্ভাব, হিরণ্যকশিপু বধ ও ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কর্তৃক ভগবানের স্তব, নবম অধ্যায় প্রহ্লাদের নৃসিংহ স্তব ও দশম অধ্যায় প্রহ্লাদের রাজ্যাভিষেক বর্ণনা করেছেন কবি। তিনি তাঁর কাব্যের তৃতীয় অধ্যায়ে মূল ভাগবতের দশম অধ্যায়ের কিয়দংশ ত্রিপুর দহন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। এখানে তিনি ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ও ৭০ সংখ্যক শ্লোকগুলি অনুবাদে রেখেছেন। চতুর্থ অধ্যায় কবি শুরু করেছেন একাদশ অধ্যায়ের মানবধর্ম, বর্ণধর্ম শ্রবণ কাহিনি দিয়ে। এই অধ্যায়ে ভাগবতের দ্বাদশ অধ্যায় বিভিন্ন আশ্রম ধর্মের কথা, ত্রয়োদশ অধ্যায় যতি ধর্ম নিরূপণ এবং অবধূত প্রহ্লাদ সংবাদ থেকে কাহিনি নিয়ে কবি তাঁর কাব্যের কাহিনি গড়েছেন।

পঞ্চম অধ্যায় কবি লিখেছেন ভাগবতের চতুর্দশ অধ্যায় 'গৃহস্থের বিশিষ্ট ধর্ম' ও পঞ্চদশ অধ্যায় 'বর্ণাশ্রম ধর্মের সারকথা' অংশ থেকে কাহিনি গ্রহণ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে অধ্যায় আছে ২৪টি। রঘুনাথের প্রেমতরঙ্গিণী কাব্যে কবি অধ্যায় করেছেন মোট ৭টি। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' কাব্যের অষ্টম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের কাহিনি শুরু হয়েছে ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় 'মন্বন্তর বর্ণনা' অংশ দিয়েই। এরপর একে একে দ্বিতীয় অধ্যায় গজেন্দ্র উপাখ্যান, তৃতীয় অধ্যায় গজেন্দ্র কর্তৃক ভগবানের স্তুতি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এরপরেই দেখা যায়, তিনি দ্বিতীয় অধ্যায় লিখেছেন মূল ভাগবতের পঞ্চম অধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে। এখানে চতুর্থ স্কন্ধ গজরাজের স্বর্গে গমন অধ্যায় তিনি পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের কাহিনিতে আছে দেবতাদের ব্রহ্মার নিকট গমন ও ব্রহ্মার পরমেশ্বর প্রাপ্তি। অষ্টম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় সমুদ্র মন্থনের জন্য দেবাসুরের সন্ধিস্থাপন ও অমৃতলাভের প্রয়াস অনুবাদ করে কবি সপ্তম অধ্যায় সমুদ্রমন্থনে কালকূট বিষের উৎপত্তি এবং মহাদেবের বিষপান অধ্যায় অনুবাদ করেছেন। অষ্টম অধ্যায় ভগবানের মোহিনী রূপ ধারণ, নবম অধ্যায় মোহিনীরূপে ভগবানের অমৃত পরিবেশন, দশম অধ্যায় দেবাসুর সংগ্রাম অনুবাদ করেছেন। এখানে লক্ষণীয়, দশম অধ্যায়ের কিছু অংশ তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং বাকি অংশ তৃতীয় অধ্যায়ে রেখেছেন। তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণভাবেই দেবাসুরের যুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন কবি। একাদশ অধ্যায়ের যুদ্ধাবসান বিষয়ে আলাদা ভাবে কোন অধ্যায় বিভাজন তিনি করেননি। কিন্তু ব্রহ্মার আদেশে নারদের প্রবোধ বাক্যে যে যুদ্ধাবসান হয়েছে তা কবি কয়েকটি পংক্তির অনুবাদে দেখিয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে কবি ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের শ্রীভগবানের মোহিনী রূপ দর্শনে শঙ্করের মোহ বর্ণনা করেছেন। পঞ্চম অধ্যায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভবিষ্যৎ সপ্ত মন্বন্তর কাহিনি দিয়ে শুরু করেছেন কবি। এই অধ্যায় থেকে তিনি ১ম, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ১০ম, ১১শ শ্লোকেরই অনুবাদ করেছেন। চতুর্দশ অধ্যায় মনুদের পৃথক পৃথক কর্ম নিরূপণ তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করে পঞ্চদশ অধ্যায় দৈত্যরাজ বলির শ্রীবৃদ্ধি ও বলিরাজের হস্তে সুরগণের লাঞ্ছনা বর্ণনা করেছেন। ষোড়শ অধ্যায়ের দেবমাতা অদিতিকে কশ্যপ মুনির পয়োব্রত উপদেশ দান অংশও কবি এই অধ্যায়ে রেখেছেন। এরপর সপ্তদশ অধ্যায় অদিতির গর্ভে ভগবানের জন্ম এবং অদিতিকে ভগবানের বরদান অধ্যায়ের অনুবাদ। অষ্টাদশ অধ্যায় বলির যজ্ঞশালায় ভগবানের বামন অবতার রূপে আবির্ভাবের কিছু অংশ

কবি অনুবাদে রেখেছেন। এরপর বলির নিকট বামনদেবের ত্রিপাদভূমির প্রার্থনা, বলির প্রতিজ্ঞা ও শুক্রাচার্যের বাধাদান অধ্যায় অনুবাদ করেছেন কবি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি ভাগবতের বিংশ অধ্যায় 'বামন অবতারের বিরাটরূপ ধারণ' এবং পৃথিবী ও স্বর্গকে ব্যাপ্ত করে দুই পদক্ষেপ গ্রহণ বর্ণনা করেছেন কবি। ভাগবতের একবিংশ অধ্যায় 'বিষ্ণু কর্তৃক বলির বন্ধন' অংশও তিনি অনুবাদে রেখেছেন। এই অধ্যায় থেকে ১ম, ২য়, ৫ম, ৭ম তারপর আবার ৩য়, ৪র্থ, ৮ম, ১৬শ, ১৭শ, ২৬শ, ২৮শ, ২৯শ, ৩২শ, ৩৩শ শ্লোকের অনুবাদ করেছেন কবি। ২২তম অধ্যায় সত্যনিষ্ঠ বলির বন্ধনমুক্তি ও ভগবান কর্তৃক বরলাভ অনুবাদ করেছেন। ২৩তম অধ্যায় 'বলির সুতল-লোকে গমন' অধ্যায়ের অনুবাদ করে এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের সমাপ্তি টেনেছেন কবি। সপ্তম অধ্যায়ে কবি মূল ভাগবতের চতুর্বিংশ অধ্যায় ভগবানের মৎসাবতার কাহিনি অনুবাদ করে এই স্কন্ধ সমাপ্ত করেছেন।

ভাগবতের নবম স্কন্ধে অধ্যায় আছে ২৪টি। রঘুনাথ তাঁর কাব্যে অধ্যায় রেখেছেন ৯টি। নবম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় 'সূর্যবংশ কথা' অবলম্বন করে কবি তাঁর কাব্যের প্রথম অধ্যায় লিখেছেন। এখানে ঋষি বশিষ্ঠের বরে ইলার সুদ্যম্ন-প্রাপ্তি কথা, কার্তিকবনে বন্ধুগণ সহ তাঁর স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি, শ্রীপুরূরবার উৎপত্তি, শংকরের বরে সুদ্যম্নের নারীত্ব ও পুরুষত্ব লাভ প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তিনি বশিষ্ঠ শাপে 'পৃষধ্রের' শূদ্রত্বলাভ ও শ্রীহরির আরাধনায় সিদ্ধি প্রাপ্তি বর্ণনা করেছেন। নবম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায় থেকে তিনি মহর্ষি চ্যবন ও সুকন্যা-রেবতীর কাহিনি এবং ব্রহ্মার আদেশে রেবত রাজার কন্যা রেবতীকে বলদেবের হস্তে সমর্পণের কাহিনিটুকু গ্রহণ করেছেন। নবম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায় নভগ ও অম্বরীষের বংশ কাহিনি তিনি অনুবাদ করেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি মূল ভাগবতের পঞ্চম অধ্যায় দুর্বাসার দুঃখ থেকে পরিত্রাণ অংশও রেখেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের কাহিনিকে ভেঙে তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় করে নিয়েছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি মূল ভাগবতের সপ্তম অধ্যায় এবং অষ্টম অধ্যায় সগর বংশের উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, ভগীরথ বংশ, সৌদাস বৃত্তান্ত বর্ণনা করে দশম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জীবনচরিতকথা অনুবাদ করেছেন। তিনি দু-একটি শ্লোকের অনুবাদ করে রামচন্দ্রের তাড়কা-বধলীলা, ধনুর্ভঙ্গ, বনবাসলীলা, সেতুবন্ধলীলা, রাম-রাবণ যুদ্ধ, রাবণ বধ প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। মূল ভাগবতের নবম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায় রামচন্দ্রের যজ্ঞ সম্পাদন তিনি এই পঞ্চম অধ্যায়ে রেখেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কাহিনি তিনি শুরু করেছেন নবম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায় কুশ বংশ বর্ণনা দিয়ে। এরপর ত্রয়োদশ অধ্যায় নিমি রাজার পুনর্জন্ম ও তাঁর পুত্র জনক রাজার বংশ বর্ণনা করেছেন কবি। সপ্তম অধ্যায়ে তিনি রেখেছেন ভাগবতের চতুর্দশ অধ্যায় সোমবংশের কাহিনি, পঞ্চদশ অধ্যায় ঋচীক, জমদগ্নি ও পরশুরামের উপাখ্যান, ষোড়শ অধ্যায় পরশুরামের ক্ষত্রীয় নিধন অংশ। অষ্টম অধ্যায়ে আছে ভাগবতের সপ্তদশ অধ্যায় আয়ু বংশকথা, রজি রাজার বংশ, অষ্টাদশ অধ্যায় যযাতি উপাখ্যান, ঊনবিংশ অধ্যায় যযাতির বৈরাগ্য, বিংশ অধ্যায় পুরু বংশ, রাজা দুষ্মন্ত ও ভরত চরিত্র কথা, একবিংশ অধ্যায় রাজা রন্তিদেবের প্রসঙ্গ এবং দ্বাবিংশ অধ্যায় জরাসন্ধ, যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনাদির জন্ম কথা। নবম অধ্যায়ে তিনি অনুবাদে রেখেছেন শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—যদুবংশ বিস্তার ও ২৪ তম অধ্যায়, বিদর্ভ পুত্রদের কাহিনি। এই পর্যন্তই নবম স্কন্ধের বিস্তার। এরপরে তিনি দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করেছেন। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের তিনি প্রায় সব শ্লোকেরই অনুবাদ করেছেন। সংস্কৃত ভাগবতের মূল শ্লোকের হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ এই তিনটি স্কন্ধ।

আলোচনার শেষে বলা যায়, রঘুনাথ পাণ্ডিত্য সহকারে মূল ভাগবতের প্রায় সব স্কন্ধেরই অনুবাদ করেছেন। দেখা যায়, কোন স্কন্ধের অধ্যায় থেকে তিনি কাহিনি গ্রহণ করেছেন, কোন কোন কাহিনি আবার বর্জন করেছেন। আমরা এটিও লক্ষ করেছি যে, কখনও তিনি কোন অধ্যায়ের কাহিনি বিক্ষিপ্ত ভাবে আগের ও পরের অধ্যায়েও রেখেছেন। কিন্তু মূল ভাগবতের কাহিনিকে তিনি কোথাও পরিবর্তন করেন নি। স্বকপোল কল্পিত রচনা পরিহার করে তিনি যথাসাধ্য মূলকে অনুসরণ করে তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গড়ে তুলেছেন। কাব্যের আকার ও অবয়ব এর দিকে নজর দিতে গিয়ে অনেক সময় মূলের বর্ণনার বহর ও খুঁটিনাটি তথ্য বাদ দিতে হয়েছে কবিকে। আর সে কারণেই হয়তো কাব্যটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তাঁর কথায়—

> "ভাগবতের মতো বিচিত্র বিষয়পূর্ণ ও দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বে স্ফীতকায় পুরাণ গ্রন্থের পুরা অনুবাদ করিতে গিয়া পয়ার ত্রিপদীতে পাড়ি জমানো অতিশয় দুরূহ। কবি তাহাতে সাফল্যলাভ করিয়াছেন। ইহাতে পরিচ্ছন্ন পয়ারে মুল কাহিনি বা তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্বেও ইহার ধারাবাহিকতা বিশেষ ক্ষুন্ন হয় নাই।"[৫১]

তথ্যসূত্র :

১. চৌধুরী শ্রীভূদেব: 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা', প্রথম পর্যায়, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬, দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৫৭, পৃষ্ঠা – ৩৫৯।

২. বিদ্যাসাগর, নন্দলাল (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', ময়মনসিংহ, ঢাকা, ৪৫৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ; ৩০ শে কার্ত্তিক, প্রকাশ- ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - নিবেদন অংশ।

৩. সেন, দীনেশচন্দ্র : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', দ্বিতীয় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আর্য ম্যানসন (নবম তল), ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, নবম সংস্করণ, পর্ষৎ কর্তৃক প্রথম মুদ্রণ ১৯৮৬/এ, পর্ষৎ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০০২/বি, পৃষ্ঠা - ৫৪০।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', (দ্বিতীয় খণ্ড-চৈতন্য যুগ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ- ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ৭২২।

৫. অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত) : 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ', প্রথম খণ্ড, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর (ইউ.পি), প্রধান কার্যালয়-- গোবিন্দ ভবন, ১৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, ত্রয়োদশ সংস্করণ, প্রকাশকাল : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ৪৬।

৬. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭/১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ৩।

৭. অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত) : 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ', প্রথম খণ্ড, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর (ইউ.পি), প্রধান কার্যালয়-- গোবিন্দ ভবন, ১৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, ত্রয়োদশ সংস্করণ, প্রকাশকাল : ২০১৬, পৃষ্ঠা - ৫৫।

৮. পরমহংস, বিষ্ণুপাদ ভাগবত মহারাজ (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা-৩, তৃতীয় সংস্করণ,

প্রকাশকাল- ১২ই চৈত্র, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ২৬ শে মার্চ, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, প্রথম স্কন্ধ, পৃষ্ঠা - ৬।

৯. স্বামী, অখণ্ডানন্দ সম্পাদিত : 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ', গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর (ইউ.পি), ত্রয়োদশ সংস্করণ, প্রকাশকাল-২০১৬, প্রধান কার্যালয়- গোবিন্দ ভবন, ১৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৭০০০০৭, পৃষ্ঠা – ১৫৪।

১০. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭/১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ৯।

১১. ঐ, পৃষ্ঠা - ১২।

১২. শাস্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণদাস (সম্পাদিত) : 'শ্রীশ্রীপদ্যাবলী', শ্রীরূপ গোস্বামী সংগৃহীত, শ্রীআনন্দগোপাল বেদান্তচার্য্য অনুবাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা- ৭০০০০৬, প্রকাশ- শ্রীঅন্নকূট গোবর্দ্ধন-পূজা তিথি, ১১ কার্তিক, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, ২৮ অক্টোবর, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা - ২৩-২৪।

১৩. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭/১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ১।

১৪. পরমহংস, বিষ্ণুপাদ ভাগবত মহারাজ (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা-৩, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল- ১২ই চৈত্র, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ২৬ শে মার্চ, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, প্রথম স্কন্ধ, পৃষ্ঠা - ১।

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা – ১।

১৬. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭/১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ১।

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা - ২।

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ১।

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা - ২।

২০. ঐ, পৃষ্ঠা - ২।

২১. ঐ, পৃষ্ঠা - ২।

২২. ঐ, পৃষ্ঠা - ২।

২৩. অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত) : 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ', প্রথম খণ্ড, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর (ইউ.পি), প্রধান কার্যালয়-- গোবিন্দ ভবন, ১৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, ত্রয়োদশ সংস্করণ, প্রকাশ : ২০১৬,পৃষ্ঠা - ৪৮।

২৪. পরমহংস, বিষ্ণুপাদ ভাগবত মহারাজ (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা-৩, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল- ১২ই চৈত্র, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ২৬ শে মার্চ, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, প্রথম স্কন্ধ, পৃষ্ঠা -২।

২৫. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭/১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ৪।

২৬. ঐ, পৃষ্ঠা - ৪।

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা - ৫।

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ৫।

২৯. ঐ, পৃষ্ঠা - ৫।

৩০. ঐ, পৃষ্ঠা - ৬।

৩১. ঐ, পৃষ্ঠা - ৬।

৩২. ঐ, পৃষ্ঠা - ৬।

৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা - ৭।

৩৪. অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত) : 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ', প্রথম খণ্ড, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর (ইউ.পি), প্রধান কার্যালয়-- গোবিন্দ ভবন, ১৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, ত্রয়োদশ সংস্করণ, প্রকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা - ১৪১-১৪২।

৩৫. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭/১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ৮।

৩৬. ঐ, পৃষ্ঠা – ৮।

৩৭. ঐ, পৃষ্ঠা - ৯।

৩৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ৯।

৩৯. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১।

৪০. অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত) : 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ', প্রথম খণ্ড, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর (ইউ.পি), প্রধান কার্যালয়-- গোবিন্দ ভবন, ১৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, ত্রয়োদশ সংস্করণ, প্রকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১৮২।

৪১. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭/১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ১২।

৪২. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১।

৪৩. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৩।

৪৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৯।

৪৫. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৯।

৪৬. অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত) : 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ', প্রথম খণ্ড, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর (ইউ.পি), প্রধান কার্যালয়-- গোবিন্দ ভবন, ১৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, ত্রয়োদশ সংস্করণ, প্রকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা - ২৮৫-২৮৬।

৪৭. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : 'রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ২০।

৪৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ২৫।

৪৯. ঐ, পৃষ্ঠা - ৮০।

৫০. ঐ, পৃষ্ঠা - ৮৫।

৫১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', (দ্বিতীয় খণ্ড-চৈতন্য যুগ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ৭২৫।